
কৃষণ চন্দর
পিকনিক
BIDYA

পিকনিক

কৃষণ চন্দর

প্রকাশ কাল ॥ ভাদ্র ১৩৯৪

মুদ্রাকর ॥ দি অন্নদা প্রিন্টার্স ॥ ১১ই গোয়াবাগান স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭০০০০৬
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ॥ স্পেকট্রাম ॥ ১৭ মণীন্দ্র মিত্র রো ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

দশ টাকা

ভাষান্তর ॥ রামশঙ্কর দ্বিবেদী

প্রকাশক ॥ রেণুকা সাহা ॥ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ॥ বিদ্যাঅশোক ॥ বেলা নগর ॥ হাওড়া ৭১১২০১

পুষি মুন্নি ভূটান ও বাবুয়াকে

দীপায়ণ প্রকাশিত অন্যান্য কিশোর উপন্যাস

ম্যাকসিম্ গর্কি

মা

হাওয়ার্ড ফাস্ট

টলহাণ্টার

টনি এ্যাণ্ড দি ওয়াণ্ডারফুল ডোর

জিওফ্র ট্রীজ

বোজ এগেনস্ট দি ব্যারণস

মার্ক টোয়েন

টমস্যয়ার এ্যাব্রড

ফ্রড উইলমান

রিইউনিয়ান

উইল জেমস

স্মোকি

কৃষণ চন্দর

লালতাজ

জঙ্গল কী রাজা

দেববৃত মুখোপাধ্যায়

রূপকথা

পিকনিক

কৃষণ চন্দর



দীপায়ন ॥ ২০ কেশব সেন ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

বোম্বাই এর রুস্তমজি হাইস্কুলেরা ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেক বৎসরই পিকনিক করতে যায়। এবার ঠিক হয়েছে স্টিমারে করে গোয়ায় যাওয়া হবে। পনের দিনের ভ্রমণ। জাহাজঘাটায় মস্ত বড় একটা সুন্দর স্টীমার নোঙ্গর করে রয়েছে। স্কুলের প্রধানশিক্ষক মহাশয় সব দেখাশোনা করছেন। ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে মাত্র পঁচিশটাকা, বাকী সব খরচ স্কুলের। গোয়ায় যাতায়াত, পনের দিনের খাওয়া দাওয়া, বেড়ানো সব এর মধ্যেই ধরা হয়েছে। এবার



পিকনিকে যাওয়ার জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক ছাত্রই যেতে চাইছে এই পিকনিকে। আজকেই বিকালে স্টীমার ছাড়বে। জাহাজঘাটায় সব ছেলেমেয়েরা ভীড় করে রয়েছে। অনেক ছেলেমেয়েরা এরই মধ্যে স্টীমারে উঠে পড়েছে। কেউ দোতালায় কেউ একতলায় দাঁড়িয়ে তাদের বন্ধুদের ডাকাডাকি করছে। প্রত্যেকের টিকিট পরীক্ষা করে স্টীমারে উঠতে দেওয়া হচ্ছে। সমুদ্রে দাঁড়ানো অন্যান্য জাহাজ থেকে ইঞ্জিনের গর্জন ও সিটি শোনা যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের বুক আনন্দে আনচান করছে। যেসব ছেলেমেয়েদের সাথে তাদের বাবা মা এসেছেন, তারা ছেলেমেয়েদের সব বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু ছেলেমেয়েরা সেসব উপদেশ কানে না নিয়ে মুখে শুধু হুঁ হাঁ করছে। কখন স্টীমারে বন্ধুদের কাছে পৌছবে তার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে তারা।

স্কুলের সবচেয়ে মোটা ছেলে হলো রোমু। গোলগাল বিশাল চেহারা তার। ক্লাস সেভেনে পড়ে সে। স্টীমারের রেলিং ধরে সে বিরাট মোটা গোল হাত নাড়িয়ে সে তার জাহাজঘাটায়

দাঁড়ানো বন্ধুদের চীৎকার করে ডাকলো এ সন্দীপ, এ ধামুয়া ইধার আও ভাই—ইধার আও। সন্দীপ ও ধামুয়া তার একই ক্লাসের বন্ধু। ওরা তুজনে তখন প্রধানশিক্ষক মহাশয়কে স্টীমারে উঠবার টিকিট দেখাচ্ছে। ওরাও হাত নেড়ে রোমুর ডাকের প্রত্যুত্তর জানালো। রোমুর হাতে অনেকগুলো রঙীন বেলুন। হঠাৎ তুম তুম করে কয়েকটা বেলুন ফেটে যাওয়াতে রোমু পেছনে তাকিয়ে দেখে ক্লাস নাইনের কৃষ্ণ বেলুনে সেফটিপিনের খোঁচা দিচ্ছে। কৃষ্ণর পাশে দাঁড়িয়ে ওর বোন সুধা, ওরা তুজনে বেলুন ফাটার শব্দে মহা মজা পেয়ে খিলখিল করে হাসছে। রোমুর খুব রাগ হলো। সে প্রতিবাদ জানিয়ে ঘুসি পাকিয়ে কৃষ্ণর দিকে তেড়ে গেলো। কিন্তু কৃষ্ণ ওর চেয়ে বয়সে বড় আর ওর চেহারাও মস্ত। মোটা হওয়ার জন্য রোমু ঘুষি মারার আগেই কৃষ্ণ তাকে জোরে ধাক্কা দিলো। রোমু ধপ করে পড়ে যেতেই সব ছেলেরা মজা পেয়ে হাততালি দিয়ে হা হা করে হাসতে লাগলো।

দূরে দেখা গেলো একটা ছেলে রাস্তা দিয়ে একটুকরো পাথরকে লাথি মারতে মারতে জাহাজঘাটার দিকে আসছে। ছেলেটার নাম সুখিয়া, ও ক্লাস সেভেনে পড়ে। একটা তালি লাগানো প্যাণ্টের উপর বাড়িতে ধোয়া জামা পরেছে ছেলেটা, কাঁধে একটা ঝোলা। পাথরটাকে ক্রমাগত লাথি মারার জন্য ওর চটির ফিতে খুলে গেলো। ছেড়া চটি পায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে জাহাজঘাটার দিকে এগোচ্ছিলো সুখিয়া, সামনে তাকিয়ে দেখে কাশেম আসছে। কাশেমকে দেখে সুখিয়া রাস্তা থেকে একটা পাথরের টুকরো তুলে চটির পেরেকে ঠুকতে লাগলো। কাসেম ওর বন্ধু। কাসেমের বাবা সব্জী ও ফল মণ্ডীর সবচেয়ে অর্থবান ব্যবসায়ী, এছাড়াও ওদের চামড়ার মস্ত কারবার আছে। কাসেমের পিছন পিছন একটা কুলী মাথায় করে ওর ট্রাঙ্ক সুটকেস বিছানাপত্র ও ফলের টুকরি নিয়ে আসছে। কাশেম সুখিয়ার কাছে এসে বললো, এই সুখিয়া কি করছিস্ এখানে ?

চটিতে পেরেক ঠুকছি।

অ্যাঁ, মুচীর ছেলের চটিতেও পেরেক ঠুকতে হয় নাকি!

মুখ তুলে হাসলো সুখিয়া। সুখিয়া যে মুচীর ছেলে তা স্কুলের সবাই জানে। ওর বাবা শানুরামের বাজারের চত্বরে ইরানী রেস্তোরার সামনে জুতো তৈরী ও মেরামতের একটা দোকান আছে। স্কুলছুটির পরে ও ছুটিছাটায় সুখিয়া দোকানে বসে ওর বাবাকে কাজে সাহায্য করে। ছোটবেলা থেকে সুখিয়া পড়াশোনা শেখার জন্য খুবই পরিশ্রম করে। স্কুলের ছেলেরা ওকে মুচির ছেলে বলে খ্যাপালেও ও কিছু মনে করে না—কারণ সত্যিই তো ও মুচির ছেলে। লেখাপড়ায় বা খেলাধুলায় কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে যায় সুখিয়া। সুখিয়া চটি ঠিক করে উঠতে উঠতে বললো, আরে কাশেম ভাইয়া, মুচীর ছেলের জুতোই বেশী খারাপ হয়।

কাশেম জড়িয়ে ধরলো সুখিয়াকে। যদিও কাশেম উঁচু ক্লাশে পড়ে তাহলেও ওদের দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। হাসতে হাসতে কাশেম বললো, আমি ভাবলাম তুই বোধহয় যাবি না।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। বোধহয় যেতে পারবো না।

তাহলে কেমন করে যাচ্ছিস?

বাবা কিছু টাকা দিলেন।

ক'টাকা দিয়েছেন?

পাঁচটাকার একটা নোট বের করে সুখিয়া দেখালো। আশ্চর্য হয়ে কাশেম বললো, আরে এতো পাঁচ টাকা। পিকনিকের চাঁদাতো পঁচিশ টাকা।

আরে আমি এই পাঁচটাকাতেই পিকনিক যাবো, আর গোয়া দেখে আসবো। জাহাজে না যেতে পারলে পায়ে হেঁটেই যাবো।

কাশেম এই কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে হাঁটতে লাগলো। তারপর পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে সুখিয়ার হাতে গুঁজে দিয়ে বললো, তুই এই দশটাকা রাখ, আব্বা আমাকে দশটাকা

বেশী দিয়েছিলেন হাত খরচের জন্য।

পনেরো টাকা হলো, হেড স্যারকে বলবো বাকি টাকাটা আমাকে ধার দেয়ার জন্য।

আচ্ছা তাই বলিস্। কিন্তু তোর জামাকাপড়, বিছানা পত্র কই ?

নেই।

জামাকাপড়ও আনিস নি ?

সুখিয়া তার ঝোলা ব্যাগ দেখালো।

ওর ভিতর কি নিয়েছিস, খুব ভারী বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, অনেক মিষ্টি আর খাবার আছে।

সত্যি !

হ্যাঁ, হাত ঢুকিয়ে দেখ্ না।

কাশেম থলের ভিতর হাত ঢোকাতেই একটা নরম কিছুতে ওর হাত লাগলো। কুঁই কুঁই করে শব্দ হলো। কাশেম ওটাকে হাতে করে বের করে আনলো, কি ব্যাপাররে সুখিয়া, এটাতো কুকুরের বাচ্চা।

সুখিয়া হো হো করে হাসতে হাসতে বললো, কাশেমভাইয়া, মিষ্টি খাবার খাবে না।

কাশেম অবাক চোখে সুখিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আরে পাগলা, এই কুকুরটাও তোর সাথে যাবে নাকি ?

হ্যাঁ, এটাকে নিয়েই যাবো।

কেমন করে নিয়ে যাবি ?

কাশেমের হাত থেকে কুকুরছানাটাকে নিয়ে আবার থলের ভিতরে পুরে বললো,এই ভাবে।

দুজনে জাহাজঘাটার দিকে এগিয়ে চললো। ওরা দেখে কৃষ্ণ স্টীমার থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে আসছে। ওর বাড়ি থেকে দুজন কাজের লোক একগাদা মালপত্র মাথায় নিয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কৃষ্ণ কাশেমের সাথে একক্লাসে পড়ে।

কাশেম এগিয়ে যেয়ে ডাকলো,এই কৃষ্ণ।

আরে কাশেম। এতো দেরী !

এখনও স্টীমার ছাড়তে দেরী আছে। তারপর কৃষ্ণর মালপত্রর দিকে তাকিয়ে বললো, পনের দিনের ভ্রমণে এতো মালপত্র, কি ব্যাপার ?

ব্যাপার খুব সুবিধের নয়। মনে হচ্ছে কিছু মাল চোরাইচালান হবে। সুখিয়া ফোড়ন কাটলো।

কৃষ্ণ বেজায় রেগে সুখিয়ার দিকে তাকালো, তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, আমাকে স্মাগলার বলা হচ্ছে। তবেরে ব্যাটা মূচী, দাঁড়া দেখাচ্ছি তোর মজা।

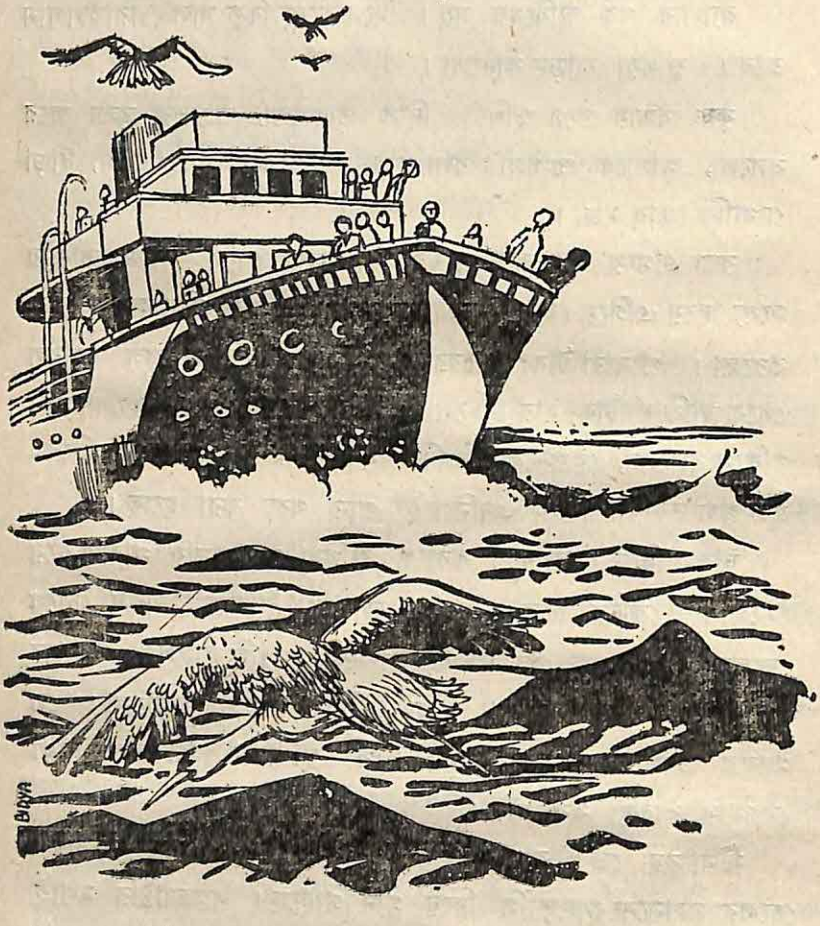
কৃষ্ণ এগিয়ে আসতেই সুখিয়া বাতাসের বেগে দৌড়ে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেয়ে হেডমাষ্টার মহাশয়ের সাথে কথা বলতে সুরু করলো। পনেরো টাকা স্যারের হাতে জমা দিয়ে সে স্কুল তহবিল থেকে বাকি দশটাকা ধার চাইলো। কিন্তু স্যার ধার দিতে চাইলেন না। বুঝিয়ে বললেন, একজনকে ধার দিলে সবাই ধার চাইবে। পিকনিকের জন্য স্কুল তহবিল থেকে এমনিতেই প্রচুর খরচ করা হচ্ছে।

টাকা দিতে অস্বীকার করাতে সুখিয়া মন বেজায় খারাপ হয়ে গেলো। জেটির এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে উদাস চোখে ছেলেমেয়েদের একের পর এক স্টীমারে ওঠা দেখছিলো সে। স্টীমারে মালপত্র রেখে কাশেম নেমে এসে সুখিয়ার পাশে দাঁড়ালো। সে মতলব ভাঁজতে লাগলো কেমন করে সুখিয়াকে স্টীমারের মধ্যে নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

স্টীমারের ভোঁ বাজলো—ছাড়বার জন্য তৈরী হচ্ছে স্টীমার। ছেলেরা মহানন্দে হাততালি দিয়ে গান গাইছে। হেডমাষ্টার মশাই সবাইকে স্টীমারে উঠে যেতে বললেন। একমাত্র কাশেম বাদে সবাই স্টীমারে উঠে পড়েছে। উনি রাগত স্বরে কাশেমকে বললেন, কি ব্যাপার তুমি উঠছো না কেন, আমার কথা কি শুনতে পাওনি ?

সুখিয়া জলভরা চোখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

যাচ্ছি স্যার, বলে কাসেম হেডমাষ্টার মহাশয়ের সাথে স্টীমারে উঠবার জন্য এগোলো। সুখিয়া হটাৎ দৌড়ে যেয়ে কাশেমের জামা টেনে ধরে তার কানে কানে কিছু বললো। সে অনেক চিন্তা করে এই বুদ্ধি বের করেছে। সুখিয়ার কথা শুনে কাশেমের মুখ হাসিতে



উজ্বল হয়ে উঠলো। সে সুখিয়ার পিঠ চাপড়ে এক দৌড়ে স্টীমারের পাশে যেয়ে থামলো। অনেকগুলো মাছধরা জেলে নৌকো স্টীমারের পাশে জাহাজঘাটায় বাঁধা ছিলো। তারা জাল টাল গুছোচ্ছে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে বলে। কাশেম একটা নৌকার মাঝিকে কাছে

ডাকলো, তাকে কিছু কথা বলে হাতে পাঁচটাকার একটা নোট গুঁজে দিলো। মাঝি ঘাট থেকে নৌকা খুলে তীরের দিকে দ্রুত এগোলো, তীরে নৌকো লাগতেই সুখিয়া দৌড়ে স্টীমারের আড়াল দিয়ে জলে নেমে নৌকায় উঠে পড়লো। নৌকা সুখিয়াকে নিয়ে স্টীমারের পিছনের দিকে এগিয়ে চল্‌লো। কাশেম স্টীমারে উঠে পিছনের ডেকে যেয়ে দাঁড়িয়ে সুখিয়ার দিকে হাত নাড়ালো। নৌকাটা স্টীমারের কাছাকাছি আসতেই কাসেম ডেকের উপরে গুটিয়ে রাখা দড়ির এক প্রান্ত নৌকার উপরে ছুঁড়ে দিয়ে অন্যমাথা রেলিঙের সাথে বেঁধে দিলো। স্টীমার ভোঁ ভোঁ করে শেষবারের মতো সাইরেন বাজিয়ে স্টীমার নড়তে শুরু করলো। সুখিয়াও দড়ি বেয়ে নোঙর তুলে স্টীমারে উঠতে শুরু করেছে। প্রায় রেলিং এর কাছাকাছি উঠে পড়েছে এমন সময় কৃষ্ণ ও আরো কয়েকটি ছেলের চোখে পড়ে গেল সে। স্টীমার তখন জেটী ছাড়িয়ে অনেকটা চলে এসেছে। কৃষ্ণ চীৎকার করে বললো, আরে দেখো, মুচীর ছেলেটা পিকনিকের চাঁদা না দিয়ে দড়ি বেয়ে স্টীমারে উঠছে।

কাছেই একজন শিক্ষককে দেখতে পেয়ে ডেকে আনলো সে। তিনি সুখিয়াকে ধরবার জন্য এগোতেই সুখিয়া ডেকে নেমে কাশেমের হাতে ব্যাগটা দিয়ে ছেলেমেয়েদের ভিড়ে ঢুকে পড়লো। কিন্তু শিক্ষকমশায় অল্পক্ষণের মধ্যেই ওকে ধরে নিয়ে এলেন। তারপর ওর কান ধরে উপরের ডেকে হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে নিয়ে গেলেন উনি। হেডমাষ্টার মশাই সব কথা শুনে ওকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলতেই সুখিয়া ক্ষমা চেয়ে বললো, স্যার আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমি পিকনিকের পুরো চাঁদাই আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।

কি ভাবে দিবি তুই? তোর কাছেতো মাত্র পনেরো টাকা আছে?

না স্যার, এখন আর পনেরো টাকা নেই, দশ টাকা আছে। তবে বাকী টাকাটা স্যার আমি এক্ষুনি আপনাকে তুলে দিচ্ছি।

হেডমাষ্টার মশাই অবাক হয়ে সুখিয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সব ছেলেমেয়েরা চারপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। কেউ সুখিয়ার এই অবস্থা দেখে আনন্দিত, নানা কটূক্তি করছে, কেউ কেউ উদাসীন, আবার কেউ কেউ ওর বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছে। সুখিয়া



কাশেমের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে হাতড়াতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে ব্যাগের সাইড পকেট থেকে একটা জুতোর ক্রীমের শিশি বের

করলো। তারপর খুঁজেপেতে একটুকরো পুরোনো শক্ত কাপড় জোগাড় করে চীৎকার করে বললো,

জুতো পালিশ করাও ভাই।
পিকনিক যাবার পয়সা চাই।

একজন একজন করে ছেলেরা এগিয়ে এলো। সুখিয়া শুরু করলো পালিশ, পয়সা জমতে লাগলো তার পাশে। সুখিয়া কোনদিন স্কুলের ছেলেমেয়েদের জুতো সারাই বা পালিশ করে নি। প্রথমে তার বেশ লজ্জা সংকোচ হচ্ছিলো। কিন্তু কয়েকটা জুতো পালিশের পরই তার এই দ্বিধা সংকোচ কেটে গেলো। এ তার পরিশ্রমের আয়। আর কাজ যাই হোক না, নিজের পরিশ্রমে টাকা উপায় করলে তাতে লজ্জা কিসের?

ছেলেমেয়েরা সুখিয়ার উপস্থিত বুদ্ধি আর পিকনিকের চাঁদা জোগাড় করবার অদ্ভুত উপায় দেখে অবাক মানলো। প্রায় সবাই সুখিয়াকে পিকনিকে নিয়ে যেতে চাইছিলো, তারা তাদের জুতো সুখিয়ার কাছে বাড়িয়ে দিয়েই যথাসাধ্য পয়সা দিচ্ছিলো। মনে হচ্ছে তারা যেন জুতোপালিশ করাচ্ছে না বরং এই কাজে সুখিয়ার হাতে হাত মেলাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পিকনিকের চাঁদা উঠে গেলো। টাকা পয়সা নিয়ে সে হেডমাষ্টার মশায়ের হাতে জমা দিলো। হেডমাষ্টার মশায় ও অন্যান্য শিক্ষকরা সুখিয়ার এই উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করে আশীর্বাদ করলেন। ছেলেমেয়েরাও সুখিয়াকে অভিনন্দন জানালো। কয়েকজন ছেলে, তারমধ্যে কৃষ্ণ একজন, ডেকের একপাশে দাঁড়িয়ে জটলা করছিলো, তারা গরিব সুখিয়াকে অত্যন্ত কৃপায় দৃষ্টিতে দেখতো। যদিও সুখিয়া কখনই এসব কেয়ার করতো না।

মহানন্দে সারা দিন কেটে গেলো সবার। শুধু জল আর জল, সূর্যের উজ্বল রোদে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের অপূর্ব দৃশ্য দেখে সবাই মোহিত। সন্ধে বেলায় যখন সমুদ্রের মধ্যে সূর্য অস্ত গেলো সমস্ত ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে সেই আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য দেখলো। রাতে

খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমোবার জন্য কাশেম উপরের ডেকে একটা ভাল দেখে জায়গা ঠিক করে বিছানা পাতলো। সুখিয়া বিছানা আনে নি। কাশেম সুখিয়াকে ডেকে তার বিছানায় আধাআধি করে শুতে বললো। ওরা সবে বিছানায় বসেছে এমন সময় কৃষ্ণ এসে হাজির, তার সাথে আরো কয়েকজন। কৃষ্ণ গায়ে পরে ঝামেলা বাধাবার সুরে বললো, এই জায়গাটা আমি আগে বেছেছি, এই সুখিয়া বিছানা তোল্, এখানে আমি ঘুমোবো।

কাশেম আর সুখিয়া দুজনেই একথায় বিরক্ত হলো। কাশেম রেগে প্রতিবাদ করতে গেলো। সুখিয়া কাশেমকে নিষেধ করে বললো, বেড়াতে এসে প্রথম রাতেই ঝগড়া মারামারি করা ঠিক হবে না।

কৃষ্ণর চেহারা যদিও তাগড়াই, তবুও ওরা দুজনে মিলে কৃষ্ণকে কাবু করতে পারতো। কিন্তু সুখিয়া লড়াইয়ে না যেয়ে বিছানা গুটোতে শুরু করলো। কাশেম কিন্তু বিছানায় বসেই রইলো, সে বিছানা গুটোতে চাইলো না। সুখিয়া অনেক করে কাশেমকে বুঝিয়ে বললো, দেখো কাশেমভাই, ডেকে অনেক ভালো জায়গা খালি পড়ে রয়েছে, কৃষ্ণকে এখানে শুতে দাও।

সুখিয়ার অনুরোধে কাশেম অনিচ্ছা সত্বেও বিছানা ও মালপত্র তুলে অন্য একটা জায়গায় চলে গেলো।

কৃষ্ণ তার জিৎ হয়েছে মনে করে হাসতে হাসতে ঐ জায়গায় বিছানা পাততে শুরু করলো।

কাসেম ও সুখিয়া যে শুধু ঝগড়া মারামারি অপছন্দ করার কারণেই জায়গাটা ছেড়ে দিলো তা কিন্তু কৃষ্ণ বুঝলো না।

পরিষ্কার আকাশে তারাগুলো ঝিকমিক করছে। চারদিক গভীর কালো আঁধারে ঢাকা। শুধু ঢেউ ভেঙ্গে পড়ার একঘেয়ে শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাসেম ও সুখিয়া পাশপাশি শুয়ে রয়েছে। রেলিঙের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে একমনে চেয়ে থাকে সুখিয়া। এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র তাদের স্টীমারেই আলো জ্বলছে। স্টীমারটা যেন

অন্ধকারে বুক চিরে আলো হাতে এগিয়ে চলেছে সামনে। আকাশের তারারাও যেন ঝিকমিক করতে করতে তাদের সঙ্গী হয়ে পিকনিকে চলেছে। সুখিয়ার চোখ বুজে আসে। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, শুধু স্টীমারটা প্রচণ্ড বেগে ঝকঝক শব্দে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

গায়ে মুখে বৃষ্টির ছাঁট লাগতেই ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙ্গে গেলো সুখিয়ার। উঠে দেখে অনেকেই ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছে। বাতাসের শোঁ শোঁ গর্জন শোনা যাচ্ছে, স্টীমার ভীষণ জোরে দুলছে। আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে—ঝড় বইছে প্রবল বেগে। সমুদ্র ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠেছে। বড় বড় ঢেউ প্রবল গর্জ্জন করে স্টীমারের গায়ে আছড়ে পড়ছে। জল ছিটকে ডেকের উপরে চলে আসছে। জোর বৃষ্টি সুরু হলো। মনে হচ্ছে যেন স্টীমারটাকে নিয়ে ঢেউরা খেলা করছে। সবার কাপড়জামা বিছানাপত্র ভিজে ঢোল। ছোট ছেলেমেয়েরা ঠাণ্ডায় আর ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। এক একবার মনে হচ্ছে ঢেউ এর প্রচণ্ড ধাক্কায় স্টীমারটা যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে আর ওরা সবাই জলের মধ্যে ডুবে যাবে। সমুদ্রঝড়ের প্রবল গর্জন ও ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের কান্নার শব্দ আর ভয়ার্ত্ত চীৎকার শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ ডেকের সব আলো নিভে গেলো।

স্টীমারের বিপদ ঘণ্টা বেজে উঠলো। একজন শিক্ষক হাতে একটা হ্যারিকেন নিয়ে ভিজে সপসপে হয়ে উপরের ডেকে এসে চীৎকার করে বললেন, সবাই এক্ষুনি নীচে নেমে যাও। স্টীমারের জল উঠছে, এখনই স্টিমার ছেড়ে চলে যেতে হবে। যে যেখানে আছো নীচে নেমে এসো। বিশাল একটা ঢেউ এসে ডেকে আছড়ে পড়তেই শিক্ষকমশায় জলের তোড়ে ডেকের উপর পড়ে গেলেন। হ্যারিকেন হাত থেকে ছিটকে পড়ে নিভে গেলো। নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। এতো জোরে ঝড় বইছে যে ডেকে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে উড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবে। সুখিয়া আর

কাশেম হাত ধরাধরি করে কোনো রকমে লোহার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো। আতঙ্কে ছেলেমেয়েরা চীৎকার করে কাঁদছে। সুখিয়ার মনে হলো যেন সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভয়ঙ্কর একটি দুঃস্বপ্ন দেখছে। ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটি, স্টীমারের মাঝিমাল্লাদের ছোটাছুটি, চীৎকার চেঁচামেচি—ঝড়ের আওয়াজ, সমুদ্রের গর্জন, সব মিলিয়ে দুঃস্বপ্নের চেয়েও বেশী। বিজলীর চমকে সুখিয়া দেখলো লাইফবোট নামানো হচ্ছে। একটা লাইফবোট ভর্ত্তি হয়ে গেলো। ছেলে-মেয়েদের চীৎকার আর কান্না শোনা যাচ্ছে। মাল্লারা সান্তনা দিচ্ছে। কারা কারা ওটায় উঠলো সুখিয়া ঠাহর করতে পারলো না। একজন মাল্লা এসে ওর হাত ধরে পরের লাইফ বোটে তুলে দিলো। ও এতো ভয় পেয়ে গিয়েছে যে অন্ধকারে কেমন করে আর কাদের সাথে লাইফবোটে উঠলো তা বুঝতেই পারলো না। প্রথম লাইফ বোটটা ছেড়ে দিলো। ওদের লাইফবোটটা ভর্ত্তি হয়ে যেতেই দুজন মাল্লা ওদের লাইফবোটে উঠতে গেলো। কিন্তু প্রচণ্ড একটা ঢেউ এসে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে জলে ফেলে দিলো। ওদের বোটটা ঢেউয়ের প্রবল ধাক্কায় স্টীমার থেকে অনেক দূরে সরে গেলো।

ছেলেমেয়েরা বোট ডুবে গেছে মনে করে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো। বিদ্যুৎ চমকাতে সবাই বুঝতে পারলো—বোট ডোবেনি কিন্তু স্টীমারের চিহ্ন নেই, ওরা মাঝ সমুদ্রে। ঢেউএর প্রবল ধাক্কায় লাইফ বোট সমানে দোল খাচ্ছে, একবার ঢেউএর মাথায় পরমুহূর্ত্তে অনেক নীচে। প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি তারা ডুবে গেলো। ঘন অন্ধকার—শুধু ঢেউএর মাথায় ফেনাগুলো চিকচিক করে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা বোট ডানদিকে হেললে বাঁদিকে ঝুঁকে পড়ছে আবার বাঁ দিকে হেললে ডান দিকে ঝুঁকে পড়ছে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠছে। সত্যিই এই অন্ধকার কালিবর্ণ উত্তাল সমুদ্রে তাদের রক্ষা করার কেউ নেই। ধীরে ধীরে সুখিয়ার জ্ঞান বুদ্ধি ফিরে আসে। সে দুএকজনের নাম ধরে ডাকে। আস্তে তারা আস্তে পরস্পরের নাম

ধরে ডাকতে শুরু করে। চীৎকার করে সুখিয়া সবাইকে যে যার জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে বললো। নড়াচড়া করলে লাইফবোট ডুবে যাবে।

একটি মেয়ে কেঁদে উঠে বললো,—আমরাতো জলে ডুবেই রয়েছি—আর কেমন করে ডুববো ?

হাতের কাছে যে যা মালপত্র পেয়েছে তাই নিয়ে বোটে উঠেছে। একজনের কাছে একটা টর্চ ছিলো। টর্চ জ্বালালো সে। লাইফবোটটা ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রবল বেগে দোল খাচ্ছে। মাঝে মাঝেই দুই একটা ঢেউ লাইফবোটের উপর দিয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। নোনা জলের ঝাপটা লাগছে সবার চোখে মুখে। একটি ছোট মেয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা শুরু করে দিলো। মেয়েটির নাম হাসিনা। বয়স মাত্র আট। ওকে প্রার্থনা করতে দেখে সুধাও প্রার্থনা শুরু করলো। দুহাত বুকের উপর জড়ো করে দুচোখ বন্ধ করে সে ভগবানকে ডাকতে লাগলো।

ওদের দেখা দেখি জঙ্গলের আদিবাসী ছেলে ধামুয়া—উপরওয়ালা জান বাঁচাও, বাঁচাও জান আমাদের, বলে চীৎকার করে গান গাইতে শুরু করলো।

প্রায় সব ছেলেমেয়েরাই গলা মেলালো ওর সাথে। এরপর যার যে গান জানা ছিলো, ভজন প্রার্থনা কীর্ত্তন শুরু করলো গাইতে। ঝড়ের গর্জনের সাথে চলতে লাগলো ওদের গান। প্রার্থনা শেষ হবার পর শুরু হলো বয়স্কাউট আর গার্লগাইডের গান। তারপর মার্চিং সঙ। গান গেয়ে লড়াই করতে চায় ওরা প্রকৃতির সাথে। তারপর যার যা কবিতা, ছড়া জানা ছিলো তাই বলতে শুরু করলো। তারপর বইএ.পড়া থেকে আবৃত্তি। সব শেষ হলে শুরু হলো এমনি গান। সিনেমার চলতি গান। যার যে গান জানা ছিল তাই গাইলো সে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝড় বইছে, ঢেউ এর তাণ্ডবে লাইফবোট উল্টে যেতে চায়। গান শেষ হলে আবার শুরু হয়ে যায় কান্নাকাটি। আবার

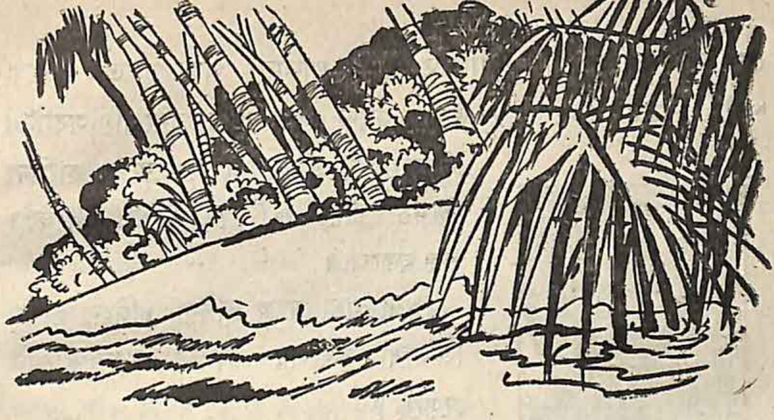
শুরু হয় গান, ঝড়ের গর্জনের সাথে, ঢেউএর তালে তালে। দুঃখ কষ্ট ভুলে গান গাইতে থাকে ওরা। ডুবে যাওয়ার ভয় থেকে মুক্তি পেতে চায় ওরা গান গেয়ে। সারারাত চলে এভাবে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে ওঠে ঢেউএর ধাক্কায়। ওদের গান বা প্রার্থনার প্রভাবেই বোধহয় লাইফবোট কয়েকবার ডুবতে ডুবতেও বেঁচে গেলো।

ধীরে ধীরে কমে আসে ঝড়ের দাপট। সমুদ্রও হয়ে আসে শান্ত। ভোর হয়। লাইফবোট মৃদুমন্দ হাওয়াও দোল খেতে খেতে ভাসতে থাকে নিঃসীম সমুদ্রে। আলো ফোটে। চারদিকে শুধু জল আর জল। খিদে তেষ্টায় বুক শুকিয়ে ওঠে সবার। তবুও খাওয়া চলবে না এই জল। আলো ফুটে উঠতে হাসি ফোটে সবার মুখে।

হঠাৎ একজন চীৎকার করে ওঠে,—ঐ দেখো, তীর, তীর!

দিকচক্রবালের কাছে সবুজের একটা আভাস দেখা যায়। সবাই মহা উৎসাহে লাইফবোটের বৈঠা বাইতে শুরু করে। ক্রমশঃ নারকেল গাছ ঘেরা তীরভূমি চোখে পড়ে। ঘন জঙ্গল। লাইফবোট ধীরে ধীরে ঢেউয়ের ধাক্কায় তীরের কাছে এগিয়ে যায়। ওরা





কোনরকমে বোট থেকে লাফিয়ে নেমে ভিজে বালির উপরেই শুয়ে পড়ে। সারারাতের অবসাদ আর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ওরা। ওদের মনে হলো, এটা বোধ হয় গোয়ার কাছাকাছি মূল তীরভূমি। কিন্তু তা নয়, এটা আসলে গভীর সমুদ্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ছোট্ট একটি নির্জন দ্বীপ।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বালিতে শুয়ে থাকার পর রৌদ্রের তাপে শরীর কিছুটা উষ্ণ হয়ে উঠলে নড়ে চড়ে উঠে বসলো সবাই।



প্রত্যেকেরই ভীষণ খিদে পেয়েছে। হাসিনা খিদের চোটে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো।

ওর কান্না দেখে সুখিয়া এগিয়ে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?

আমার খুব জলতেষ্টা আর খিদে পেয়েছে।

সজল চোখে সুধাও জানালো তারও খিদে পেয়েছে।

সুখিয়ার কুকুরছানাটা জলে ভিজে কেঁউ কেঁউ করছিলো। ওর ভিজে লোমে বালি ভর্তি হয়ে গেছে। সুখিয়া দুই হাত দিয়ে ওর গা থেকে বালি ঝেড়ে দিচ্ছিলো। এমন সময় ধপ করে একটা আওয়াজ শুনে জঙ্গলের দিকে ফিরে তাকালো সবাই। কৃষ্ণ তড়াক করে লাফ দিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে যেয়ে একটা নারকেল হাতে করে ফিরে এলো। তারপর পাথরের টুকরো আর হাত দিয়ে নারকেলটার খোসা ছাড়াতে বসলো। সবাই ঘিরে ধরলো ওকে। কৃষ্ণ এবার পাথরের সাথে ঠুকে নারকেলটা ভেঙ্গে জল খেয়ে সাদা শাঁস তুলতে শুরু করলো। ছেলেমেয়েরা সবাই আমাকে একটু দেও, আমাকে একটু দেও বলে ওর কাছে শাঁস চাইতে লাগলো। কিন্তু কৃষ্ণ কাউকে একটুও শাঁস দিলো না, সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে একাই খেতে লাগলো। শুধু ওর বোন সুধাকে একটুকরো দিতে চাইলো কিন্তু সুধা নিলো না। একা একা নারকেলটা শেষ করলো কৃষ্ণ।

ধামুয়া আর বসন্ত নারকেল গাছে উঠতে পারে, ওরা গ্রামের ছেলে। দুটো নারকেল গাছে ওরা তরতর করে বাঁদরের মতো উঠে পড়লো। গাছের মাথায় পাতার আড়ালে বসে ওরা নারকেল, ডাব

ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো নীচে। কৃষ্ণ আর একটা নারকেল পাবার জন্য এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছিলো, কিন্তু ওরা গাছের ওপর থেকে এমন ভাবে নারকেল ফেলছিলো যাতে কৃষ্ণ একটাও না পায়। সবাই তিন চারটে করে নারকেল পেলো, কৃষ্ণ বিষম রেগে বাচ্ছাদের কাছ থেকে নারকেল কেড়ে নিলো। সুধার তিনটে নারকেল থেকেও একটা কেড়ে নিলো সে, তারপর দল থেকে আলাদা হয়ে যেয়ে একা একা খেতে লাগলো। নারকেলের জল আর শাঁস থেকে খিদে তেষ্টা মেটালো সবাই। মিষ্টি শাঁস খেয়ে খিদে মিটে যেতেই চোখে গভীর ঘুম নেমে এলো ওদের। গাছের ছায়ায় ঘাসে ঢাকা মাটির উপর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো সবাই।



ঘুম ভেঙ্গে উঠে সবাই একসাথে বসে কি করা যায় তার মতলব ভাঁজছিলো। বেশ ভাল লাগছে এখন। মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে কৃষ্ণ যেন সবার মনের কথা বলে উঠলো,—বেশ মজা। স্কুল নেই, মাষ্টার মশাই নেই, পড়াশুনা নেই, বাবা মা নেই। পরীক্ষা নেই, নিষেধ করবার কেউ নেই। খেলা করো বা শুয়ে থাকো, আর খিদে পেলে নারকেল খাও। আহা কি মজা।

সবাই কৃষ্ণর কথা নিয়ে চিন্তা করছিলো। এমন সময় গুরমুখ সিং বলে উঠলো, আহা, কি মজা, কি মজা, ঘর নেই, বাড়ি নেই, রাত্রে কিন্তু বাঘ এলে, বাঁচবারও উপায় নেই।



বাঘের কথা শুনে হাসিনা সুধা ও অন্যান্য বাচ্চারা ভয়ে চীৎকার করে উঠলো।

আরে ভয় পেয়ো না, তোমরা আমরা সবাই একসঙ্গে আছি। কোন ভয় নেই। বাঘ এলে সবাই মিলে তাড়িয়ে দেবো আমরা। জঙ্গলের ভেতরে গেলে মনে হয় কোন গ্রাম পেয়ে যাবো, কাশেম বললো।

কৃষ্ণ বেশ ঘাবড়ে যেয়ে বললো, মনে হচ্ছে আমরা কোন দ্বীপে এসে পড়েছি। আমাদের হয়ত রবিনসন ক্রুসোর মতো সারাজীবন এই দ্বীপেই কাটাতে হবে। হায়, আমরা হয়ত আর কোনদিন বাবা মাকে দেখতে পাবো না।

না, না, আমরা মনে হয় গোয়ার কাছাকাছি কোন জায়গায় এসে পৌঁছেছি। সন্দীপ বললো।

সুখিয়া বললো, অত কথায় কাজ নেই। চলো, একবার জঙ্গলের ভিতরে যেয়ে খুঁজে আসি। দূরে ঐ যে একটা উঁচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওটার চূড়ায় উঠলেই মনে হয় সব বুঝতে পারা যাবে।

হ্যাঁ, সেই ভালো। ঐ পাহাড়ে উঠি চলো, চূড়ো থেকে গ্রাম বা লোকজন দেখতে পাওয়া যাবে। সুধা মহা উৎসাহে বললো।

সুখিয়া এবার সবাইকে ডেকে বললো, জঙ্গলে খামকা ঘুরে লাভ নেই, কে কে আমার সাথে পাহাড়ের চূড়োয় উঠবে বলো ?

আমি যাবো, আমি যাবো। সুধা এগিয়ে এসে বললো।

না, মেয়েরা পাহাড়ে উঠতে পারবে না। তাছাড়া জঙ্গলে সাবধানে চলতে হবে, জন্তু জানোয়ার আছে। ধামুয়া বললো।

হাম্ জায়েগা, গুরমুখ সিং জানালো। আমার বাবা নাম করা শিকারী, ছোটবেলা থেকে বাবার সাথে আমি অনেক শিকারে গিয়েছি। জঙ্গলে পথ চলবার কায়দা জানা আছে আমার।

আরে আমি তো জঙ্গলেরই ছেলে, জঙ্গলই আমাদের ঘরবাড়ি। চল্ সুখিয়া রওনা দিই। কোন তকলিফ্ হবে না। ধামুয়া বললো।

আর কেউ যাবে, সুখিয়া সবার মুখের দিকে তাকালো।

আমি যাবো। কাশেম এগিয়ে এলো।

হাম্ ভি যায়েগা, পার্শীছেলে রোমু শুয়ে শুয়ে উত্তর দিলো।

না। তোমার যাওয়া হবে না, সন্দীপ গম্ভীর মুখে বললো।

কেন ? রোমু জানতে চাইলো।

আরে ভাই. শুনো, তোমাকে বাচ্চা হাতি মনে করে বাঘ তাড়া করতে পারে। সন্দীপ বললো।

হো হো করে হেসে উঠলো সবাই।

মাটিতে শুয়ে কৃষ্ণ ঘাসের আগা চিবোচ্ছিলো।

সুখিয়া বললো, কৃষ্ণভাইয়া তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো, তুমি পথ দেখিয়ে সবাইকে পাহাড়ে নিয়ে চলো।

কৃষ্ণ তার রেডিওটা নিয়ে আসতে পেরেছিলো, সেটার নব ঘুরিয়ে কোন স্টেশন ধরবার চেষ্টা করছে সে। মুখ তুলে বললো, না না, আমার যাবার দরকার নেই। সুখিয়া তুই সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যা। চুড়োয় উঠে সবকিছু দেখে চট্‌পট্ ফিরে এসে রিপোর্ট করবি আমাকে। এখন আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

কথাগুলো বিষ্ণু হুকুমের স্বরে বলে পাস ফিরে শুলো।

এমন ভাবে কথা বলছিস্, যেন লাটসাহেব। সঞ্জীব বলে উঠলো।

ওর কথা বাদ দেও, ওকে ছাড়াই আমরা ঠিক যেতে পারবো। বসন্ত বললো।

বিষ্ণু ভাইয়া বরং অন্য ছেলেমেয়েদের এখানে দেখাশুনো করুক। সুখিয়া সবাইকে বুঝিয়ে বললো।

আমি কিন্তু কারও দেখ ভাল করতে পারবো না। আমার বেজায় ঘুম পাচ্ছে, এই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

বিষ্ণু সত্যি সত্যিই পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো।

সুখিয়া ও আর সবাই এগিয়ে চললো। সমুদ্রের তীর থেকে যতই ভিতরে যাচ্ছে ওরা, ততই হালকা ঝোপঝাড় ছেড়ে ঘন



জঙ্গল দেখতে পাচ্ছে। মস্ত বড় বড় গাছ কত উঁচুতে উঠে গেছে। সূর্যের আলো ওই সব গাছের ঘন পাতার আড়াল ছেড়ে মাটিতে পৌঁছচ্ছে না। বনের মধ্যে আধো অন্ধকার। সবুজ পাতার জন্য সূর্যের আলোকেও সবুজ বলে মনে হচ্ছে। সুখিয়া আগে কোনদিন এমন ঘন জঙ্গল দেখে নি। এই বয়সেও বোম্বে শহর ছাড়িয়ে সে এর আগে কোথাও যায় নি। এই সমুদ্র, দ্বীপ, ঘন জঙ্গল সবই তার কাছে নতুন লাগছে। দু'চোখ দিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে সবকিছু লক্ষ করছিলো সে। আপনমনে সবার আগে আগে হেঁটে সে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলো। এমন সময় পেছন থেকে কে যেন তার জামা টেনে ধরে তাকে থামিয়ে দিলো। সুখিয়া সামনে তাকিয়ে দেখে গাছের যে ডালটা সে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছিলো সেটা বেশ জোরে নড়ে উঠলো। অবাক হয়ে সভয়ে তাকিয়ে দেখে, ওটা একটা মস্তবড় সাপ।

এই সাপের নাম অজগর। অজগর গাছের ডাল বেয়ে অমন করে ঝুলে থাকে। কাছে কোন জন্তুজানোয়ার গেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে পিষে ফেলে। নিজের শরীরের চেয়ে বড় জন্তুকেও জড়িয়ে ধরে তার হাড়গোড় ভেঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গিলে খেয়ে ফেলে। ধামুয়া বললো।

গুরমুখ বললো, সুখিয়া খেয়াল রাখো, ঠিক্‌সে হাঁটো। ধামুয়াকে সবসে আগে হাঁটতে দেও। ওই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুক্। ও বনের ছেলে, বনজঙ্গল সমন্ধে ও সব কুছ জানে।

গুরমুখের কথামতো ধামুয়া সবার আগে আগে চললো। দলের

আর সবাই খুব সতর্ক হয়ে চারদিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে এগোচ্ছিল। হঠাৎ কাছেই একটা ঝোপের মধ্যে কি যেন একটা নড়ে উঠলো। সবাইকে সাবধান করে সুখিয়া বললো, সাবধান, কোন জন্তু হতে পারে।

ধামুয়া মুখে আঙুল দিয়ে সবাইকে শব্দ করতে নিষেধ করলো। ঝোপের মধ্যে সাদা মতো কি যেন দেখা গেলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা। তারপর সবাই চোখ চেয়ে দেখলো সাদা ফ্রক পরে সুধা ওই ঝোপ থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে।



সুধা তুমি? ধামুয়া বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

তুমি কেন এসেছ? গুরমুখ রাগত স্বরে বললো।

মেয়েদের জঙ্গলে ঢুকতে বারণ করা হয়েছিলো। কাসেম বললো। তুমি কথা না শুনে একা একা এলে কেন?

মেয়েদের পক্ষ থেকে আমি এসেছি। জবাব দেয় সুধা।

কাজটা তুমি মোটেই ঠিক করোনি। কাসেম বললো।

কোন মেয়েকে সাথে নিয়ে আমরা জঙ্গলে যাব না। বসন্ত জানালো।

তোমাকে আমায় নিয়ে যেতে হবে না, আমি একাই খুব যেতে পারলো। বসন্তর মুখের উপর এই কথা বলে সুধা জিভ বের করে ভেংচি কাটলো।

সুধা এখন আমাদের সাথেই চলুক, নাহলে একজনকে আবার ওর সাথে ফিরে যেতে হবে। আমাদের এখন তাড়াতাড়ী পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা দরকার। সুখিয়া বললো।

খুশি হয়ে হাততালি দিতে দিতে সুধা সুখিয়ার পিছু পিছু হাঁটতে লাগলো।

ঘনজঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে চললো ওরা, কিন্তু কোথাও লোক-জন বাস করার কোন চিহ্ন দেখতে পেলো না। এমনকি জঙ্গলের মধ্যে পায়ে চলার কোন পথও দেখতে পাওয়া গেল না। বড় বড় পাথরের টুকরো আর নানান জাতের বড় বড় গাছের জঙ্গল। ওদের পথচলায় জঙ্গলের নিথর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে। গাছের ডাল্ থেকে টর-টর-টি টি শব্দ করে চন্দনা আর কাকাতুয়ারা উড়ে জঙ্গলের সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে। গিরগিটিরা সর সর করে রঙ পালটাতে পালটাতে পালাচ্ছে। নানারকম পাখীর শিষ শোনা যাচ্ছে। কোথাও পাখিরা কিচির মিচির করে জটলা করছে। লেজ ঝুলিয়ে বসে বাঁদর হনুমানরা ফল খাচ্ছে, আর হুপহাপ করে বেড়াচ্ছে। গাছে জানা অজানা নানা রকমের ফল ধরে রয়েছে। অবাক হয়ে দেখে, ওরা এক আশ্চর্য অজানা জগতে এসে পৌঁছেছে। একদল হরিণ দেখা দিয়েই চমকে গিয়ে গভীর জঙ্গলে ছুটে পালালো, কাঠবিড়ালীরা এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছুটে পালাচ্ছে। পায়ের তলায় লম্বা লম্বা ঘাস। হঠাৎ ওদের সামনে দিয়ে বিড়ালের মতো একদল জন্তু একটা ঝোপ থেকে বেড়িয়ে ঘন জঙ্গলে উধাও হয়ে গেলো।

নানা রকমের পাখী আর জানোয়ার দেখতে দেখতে ওরা যখন পাহাড়টার অর্ধেক পর্যন্ত উঠেছে, হটাৎ একটা বাঁশঝাড়ের মধ্য থেকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে একপাল বন শুয়োর বেরিয়ে এলো, সাথে একপাল বাচ্চাকাচ্চা। সবাই সাবধানে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। ওরা আর উপরে উঠতে পারছে না, সবার গা হাত পা কাঁটার আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত, দু একজনের জামা ছিঁড়ে গেছে। ক্লান্তিতে সারা শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। তবুও ধামুয়া, সুখিয়া, গুরমুখ ও বসন্ত এগিয়ে যাবার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করতে লাগলো, কিন্তু কিছুক্ষন ওঠার পর

আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না।

সবাই ধামুয়াকে বললো,—এবার কিভাবে যাওয়া যাবে ?

ধামুয়া তরতর করে একটা উঁচু গাছের মগডালে উঠে পড়লো, পাখীরা কিচির মিচির করে উড়ে পালালো। বাঁদররা ধুপধাপ করে আশপাশের গাছে যেয়ে চিঁ চিঁ কিচ কিচ করে হাল্লা বাধিয়ে দিলো। ধামুয়া ওপর থেকে বললো, তোমরা ডান দিক দিয়ে যাও—ওখানে জঙ্গল একটু হালকা। তারপর এগাছ থেকে ওগাছের ডালে লাফিয়ে যেয়ে ধামুয়া উপর থেকে পথ বাৎলাতে লাগলো। অবশেষে চুড়ায় উঠে ওরা দেখে, চারপাশে দিগন্ত বিস্তৃত জল। মাঝ সমুদ্রে এটা একটা বেশ বড় দ্বীপ। কোন জনবতির চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘন জঙ্গল, মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু টিলা আর পাহাড়। তবে বিরাট দ্বীপ, জঙ্গলের শেষ দেখা যাচ্ছে না। হতাশ হয়ে ওরা অনেকক্ষন ধরে চুপচাপ ঘুরে ঘুরে চারপাশের দৃশ্য দেখতে লাগলো। সুধা একটু নীচের দিকে নেমে বেশ অনেকটা দূরে একটা ভাঙ্গা মতো পাথরের বাড়ি দেখতে পেয়ে চীৎকার করে সবাইকে ডাকলো,—আরে, দেখ দেখ, একটা বাড়ি।

সবাই ছুটে গেল ওর কাছে।

না, না তোমরা কেউ ওখানে যেওনা, ওটা নিশ্চয়ই ভুতদের বাড়ি।

একটা পুরোনো ভাঙা দুর্গ, যেন ড্রাকুলার ক্যাসেল—দেখ যেমন আমরা বইএর ছবিতে দেখি। গুরমুখ বললো।

ভুতদের বাড়ি নাও হতে পারে, হয়ত ওখানে রাত্রি বেলা বনপরীরা এসে নামে, খেলা করে।

না, না, ওটা সম্ভবত জলদস্যুদের আস্তানা। কাশেম বললো।

তাহলে ওখানে যাবার দরকার নেই। দস্যুরা হয়ত আমাদের আটকে রাখবে। চল, তাড়াতাড়ী এখান থেকে ফিরে যাই। বসন্ত ভয় পেয়ে বললো।

আরে বুদ্ধু, দস্যুরা এখন আমাদের খোঁজ না পেলেও এই

ছোট্ট জায়গায় পরে নিশ্চয়ই পাবে। এমনতো নয় বাড়ি ফিরে গেল লাড্ডু আর দুধ নিয়ে মা বসে আছে। বুদ্ধি খরচ করো। এতটা পথ এসে ক্যাসেলটা না দেখে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। গুরমুখ একথা বলে দুর্গটার দিকে এগিয়ে চললো।

গুরমুখ ঠিকই বলেছে, সুখিয়া বললো। ঐ দুর্গে আমরা আশ্রয় নিতে পারি। ওখানে নিশ্চয়ই দুএকটা ভাল ঘর আছে। রোদ বৃষ্টি আর হিংস্র জানোয়ারদের হাত থেকে তো অন্ততঃ বাঁচা যাবে। আর লোকজন থাকলে তো আরও ভাল, আমরা সব কথা বলে তাদের কাছে আশ্রয় বা সাহায্য চাইতে পারবো।

প্রথমে কাশেম তারপর সবাই সুখিয়াকে সমর্থন করলো।

আমরা দুর্গে চলে গেলে, আর সবার কি হবে, ওরা তো সবাই সমুদ্রের তীরে বসে আছে। সুধা বললো।

তখন সবাই বসে ঠিক করলো, ধামুয়া আর গুরমুখ সমুদ্র তীরে ফিরে যেয়ে মালপত্র এবং বাকি সবাইকে এখানে ডেকে নিয়ে আসবে। তারপর সবাই মিলে দুর্গে যাওয়া হবে।

ওরা রওনা হয়ে গেলে সুখিয়া কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা দেখতে গেলো। কিছুক্ষণ পরে অনেকগুলো পাকা লেবু নিয়ে ফিরে এলো। লেবুগুলো খুব মিষ্টি, অনেকটা মুসাম্বির মতো। খেয়ে সবার তেষ্টা মিটলো। সুখিয়া খুঁজে খুঁজে আরও কিছু লেবু জোগার করলো।

দুপুরের পর ধামুয়ার আর গুরমুখ সবাইকে নিয়ে ফিরে এলো। ছোট ছেলেমেয়েরা ক্লান্তিতে বসে পড়লো। সুখিয়া সবাইকে লেবু খেতে দিলো। ধামুয়া তাড়া লাগালো এবার জলদী পা চালাও, বিকেল হয়ে এসেছে। সূর্য ডুবে গেলে খুব অসুবিধা হবে। আবার সবাই চূড়া থেকে দুর্গের দিকে নামতে শুরু করলো।

বিকালের পড়ন্ত আলোয় ওরা দুর্গের সামনে যেয়ে উপস্থিত হলো।

পাথরের দুর্গ। চারদিকে ধংসাবশেষ ছড়ানো। অনেককাল আগেকার তৈরী। চারদিক সুনসান। লোকজনের কোন সাড়া শব্দ

পাওয়া যাচ্ছে না। গুরমুখ্ এগিয়ে যেয়ে একটা দরজায় ধাক্কা দিলো। খুব ভারী দরজা, ধাতুর পাত দিয়ে মোড়া। দরজাটা ক্যাচ ক্যাচ



আওয়াজ করে একটু ফাঁক হলো। ফরফর করে কিছু চামচিকে বেরিয়ে এলো। ভ্যাপসা গন্ধ। ভয় পেয়ে পেছিয়ে এলো ওরা। তারপর

আবার এগিয়ে যেয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো। লম্বা বারান্দা দিয়ে ভিতরে ঢুকে ওরা দেখে, ঘরগুলোর একটারও ছাদ আস্ত নেই। অধিকাংশর দেওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে। ভাঙ্গা পাথর, ছাদভাঙ্গা চুনসুরকি আর কাঠের টুকরোয় ঘরের মেঝে ভর্ত্তি। ঝপ ঝপ করে বাদুররা উড়ে পালাতে লাগলো। ছেলেমেয়েরা ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। সবাইকে বুঝিয়ে শান্ত করলো ধামুয়া। কোন ঘরে মস্ত মস্ত গাছপালা, ঘাস ও ফার্ণ গজিয়েছে। তাতে পাখীর বাসা। পাখীরা ঝটপট করে উড়ে পালাতে লাগলো। একটা ঘরে ঢুকতেই পচা গন্ধে সবাই নাক বন্ধ করলো, দেখা গেলো অনেক জন্তু জানোয়ারের হাড়গোড় পড়ে রয়েছে। তার মানে এই ঘরটায় বাঘ, হায়না বা শেয়ালের আস্তানা। দেখে মনে হচ্ছে সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এইখানে কোন মানুষজন আসে নি। দূর থেকে দূর্গটাকে বিরাট আর চমৎকার দেখাচ্ছিলো। সমুদ্রের দিকে দুর্গের পেছন দিকটা একদম ভেঙে পড়েছে। মনে হয় জাহাজ থেকে কামান দেগে দুর্গটাকে ধ্বংশ করা হয়েছিল। হয়ত পর্তুগীজদের ভারত আসার আগেকার দুর্গ এটা।

ওরা দুর্গটার এই অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে পড়লো। পাহাড়ের চুড়া থেকে দুর্গটাকে দেখে ওরা কতকিছু কল্পনা করেছিলো, কিন্তু এখন কি করবে ওরা। মন খারাপ করে সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ সুখিয়ার গলার আওয়াজ পেয়ে সবাই তাকিয়ে দেখে সমুদ্রের দিকে একদম কোনায় একটা পাঁচিলের উপর থেকে সুখিয়া হাত নেড়ে সবাইকে ডাকছে। ওরা ঘুরে ঘুরে ওখানে পৌঁছে দেখে একটা ঘর আবিষ্কার করেছে, সুখিয়া যার তিনদিনের দেওয়াল সম্পূর্ণ খাড়া আছে, আর একটা দেওয়ালেরও কিছুটা অংশ ভালো। ছাদের বেশির ভাগটা ভাল আছে কিছুটা ভেঙ্গে পড়েছে।

সুখিয়া বললো, এই ঘরটায় আমরা থাকলে কেমন হবে। ঘরটার তিনদিকে উঁচু দেওয়াল, জন্তু জানোয়াররা আসতে পারবে না। আমরা রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবো।

হ্যাঁ। এই ঘরটাই সবচেয়ে ভালো। এখানেই থাকবো আমরা। কাশেম বললো।

কিন্তু ঐ ভাঙ্গা দেওয়ালটার দিকে কি করা যাবে? আশংকা প্রকাশ করে ধামুয়া জিজ্ঞাসা করলো।

কেন? আমরা রাতে পাহারায় থাকবো। উত্তর দিলো সুখিয়া।

তাহলে কে কে রাতে পাহারা দিতে চাও? কাশেম জিজ্ঞাসা করলো। রোমু, বসন্ত, গুরমুখ, শঙ্কর ও রঞ্জন মুন্সী পাহারা দেবে বলে সম্মতি জানালো। কিন্তু কৃষ্ণর চেহারা সবার চেয়ে ভাল হওয়া সত্বেও সে ঘুমের বাহানা করে পাহারা দিতে অস্বীকার করলো। সুধা তার দাদার কথাতে লজ্বা পেয়ে কৃষ্ণর বদলে নিজে পাহারা দিতে চাইলো।

সুখিয়া হেসে বললো, না। তোমাকে আর পাহারা দিতে হবে না, অনেক পাহারাদার হয়ে গেছে আজ। প্রথম রাতে আমি আর শঙ্কর মুখার্জী আর শেষ রাতে রোমু আর বসন্ত পাহারা দেবে। বাকি সবাই ঘুমোবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কাশেম সবাইকে ঘর পরিষ্কার করবার জন্য হাত লাগাতে বললো। ছেলেরা পাথর, ইঁটের টুকরো, কাঠ ও আগাছা পরিস্কার করলো আর মেয়েরা গাছপালার ডাল ও ফার্ণের আঁটি দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করতে লাগলো। ঘর কিন্তু ভালমতো পরিষ্কার করা গেলো না। ওই ধুলো বালির মধ্যে একজায়গায় বসে সকালের অবশিষ্ট নারকেল আর মুসাম্বি দিয়ে সবাই রাতের খাওয়া সারলো। তারপর ওই খালি মেঝেতেই শুয়ে পড়লো ওরা। সারারাত সারাদিনের ক্লান্তিতে অবসন্ন সবাই। শুয়ে পড়ার সাথে সাথেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো ওরা।

নিস্তব্ধ রাত্রি। সমুদ্রের ঢেউএর হালকা গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে শেয়াল। কর্কসস্বরে রাতজাগা পাখী আর পেঁচারা ডাকছে। ভাঙ্গা ছাদের মধ্য দিয়ে মিট মিট করছে তারারা।

সুখিয়ার মনে পড়লো কাল রাতে স্টীমারের সাথে সাথে তারারাও ওদের সঙ্গী হয়ে ছিলো। আজও এই নির্জন দ্বীপে ওরা যখন ঘুমোচ্ছে, মাথার উপরে তারারা পাহারা দিচ্ছে ওদের।

সুখিয়া আর শঙ্কর ভাঙ্গা দেওয়ালটার মুখে বসে পাহারা দিচ্ছে। সুখিয়ার পায়ের কাছে ওর কুকুরটা মুখ গুঁজে শুয়ে রয়েছে। আজ সবাই এই ধুলোভরা নোংরা মেঝেতেই শুয়ে কেমন অচেতন ভাবে আরামে ঘুমোচ্ছে। দূরে কোথাও যেন একটা জন্তুর গর্জন শোনা গেলো। শঙ্কর সুখিয়াকে বললো, এটা বাঘের ডাক।

সুখিয়া মাঝরাতে বসন্ত আর রোমুকে ডেকে দিয়ে শুতে গেলো। ভাঙ্গা ছাদের উপর একজোড়া হিংস্র নীল চোখ ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে—ওরা কিন্তু দেখতে পেলো না।

পরদিন ভোরে সবাই ঘুম ভেঙ্গে উঠলে সুখিয়া বললো, প্রত্যেকেরই নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। আমাদের এখনি জঙ্গলে ঘুরে দেখতে হবে খাওয়ার জিনিস কি পাওয়া যায়। দেখতে হবে খাবার জলের ঝর্ণাইবা কতদূর ?



বসন্ত বললো, মেয়েরা এখানেই থাকুক। ছেলেরা চলো, খাবারের খোঁজে বেরোই। মেয়েরা তোমরা দুর্গ ছেড়ে বেশী দূরে যেয়ো না। দুর্গের কাছাকাছি থেকো। কোথাও গেলে সবাই একসঙ্গে যেয়ো, নাহলেহঠাৎ কেউ পথ হারিয়ে ফেললে বিপদে পড়বে।

ছেলেরা বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে মেয়েরাও দলবেঁধে ঘুরতে বেরোল। জঙ্গলের মধ্যে বেশ কিছু দূরে যাওয়ার পরে একটা ঝর্ণা খুঁজে পেলো ওরা। পরিষ্কার টলটলে জল। সবাই স্নান করতে নামলো। মজা করে এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলো ওরা। তারপর কেউ রোদে চুল শুকোতে বসলো, কেউ বা ঝর্ণার আশেপাশে নানা রঙের বনফুল তুলতে শুরু করলো। কয়েকজন একটু এগিয়ে ঝোপ জঙ্গলে খাবার মতো কোন ফলমূল পাওয়া যায় কিনা তাই খুঁজতে বেরোলো। হটাৎ সুধার চীৎকার—মটরশুটি ! মটরশুটি !

অনেকটা জায়গা জুড়ে মটরগাছের খেত হয়ে রয়েছে। প্রচুর মটরশুটি ফলে রয়েছে। হাসিনা একটা মটরশুটি ছিঁড়ে যেই মুখে পুরতে যাবে, অমনি সুধা তাকে বাধা দিয়ে বললো, একটুখানি সবুর করো, আগে মিস বোটানিকে জিজ্ঞাসা করে নিই, তারপর খেয়ো। যদি বিষাক্ত হয়।

যাকে সুধা মিস বোটানি বলেছে তার আসল নাম যমুনা। স্কুলে সবসময় বোটানিতে উৎসাহ দেখায় আর পরীক্ষায় প্রথম হয় বলে সবাই ওকে মিস বোটানি নামে ডাকে।

যমুনার চেহারা লম্বা কিন্তু পাতলা গড়নের। চোখে ভারি পাওয়ারের চশমা। বয়স আন্দাজে ওকে বেশী গম্ভীর দেখায়। ওর ভাবভঙ্গি

অনেকটা স্কুলের শিক্ষিকাদের মতো। আশপাশের জঙ্গলে খাদ্যোপযোগী ফলমূলের অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল সে। সুধা চীৎকার করে ডাকলো তাকে। মটর খেতের কাছে এসে পেঁছিলে, সুধা যমুনাকে জিজ্ঞাসা করলো,—এগুলো কি সত্যিকারের মটরশুটি?

ভাল করে দেখে, মটরশুটির দানা মুখে ফেলে যমুনা বললো, হ্যাঁ এগুলি আসল মটর, খেতে পারো তোমরা।

ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েরা মটর ক্ষেতের মধ্যে। খিদের চোটে মটরশুটি তুলে মুখে পুরতে লাগলো সবাই। মটরশুটি খেয়ে সবার পেট কিছুটা ভরলো। ওরা ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে আরও কিছু মটরশুটি তুললো। ছোট ঝর্ণাটা পেরিয়ে সুধাকে নিয়ে যমুনা ওপারে গেলো ফলমূলের খোঁজে। শাঁখআলুর লতা দেখে যমুনা আর সুধা পাথর দিয়ে মাটি খুঁড়ে কয়েকটা শাঁখআলু বের করলো। মুসাম্বি লেবুর গাছ খুঁজে পেয়ে সবাইকে ডাক দিল সে, প্রচুর মিষ্টি লেবু সংগ্রহ হলো। জংলাকুলের গাছ খুঁজে পেয়ে কুল খেলো ওরা, কিন্তু কুলগুলো বেজায় টক। তারপর খাবারের ঝোলা নিয়ে ফিরে চললো সবাই ছুর্গের দিকে।

ছুপুরের দিকে হৈহৈ করে ফিরে এলো ছেলেরা। ওরা অনেক ফল-মূল সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। খাবারের পোঁটলা খুলে খুব গর্বের সাথে ওরা মেয়েদের দেখাতে লাগলো, দেখ কি এনেছি? এই দেখ ডালিম ফল, এই দেখ ন্যাসপাতি আর কত নারকেল। ছু একছড়া কলাও বের করে দেখালো, যদিও কলাগুলো কাঁচা। ওরা বেশ কয়েককাঁদি কলা দেখে এসেছে। সব জিনিস দেখানোর পর ঠাট্টা করে বসন্ত মেয়েদের বললো, তোমরা এতক্ষণ বসে বসে কি করছিলে?

কাশেম বললো, কি আর করবে—বসে বসে গল্প করেছে, ফুল তুলেছে আর চুলের উকুন বেছেচে।

হাসিনা হেসে বললো, না সাহেব, না।

সুধা বললো, আমাদের ভাণ্ডারে কি আছে দেখাবো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি ফুল। তা ভালো তোমরা এখন ফুল

খাও আর আমরা খাব ফল। সঞ্জীব জানালো।

আরে দাদা শোন, তোমাদের ঐসব টক ন্যাসপাতি আর কাঁচা আপেলের চেয়ে অনেক ভাল জিনিস এনেছি আমরা। সুধা বললো।

কি এনেছো তোমরা, পাথরের নুড়ি, না সমুদ্রের কড়ি? সুখিয়া বললো।

তোমাদের মাথা যদি পাথরের নুড়ির মত শক্ত না হতো তাহলে তোমরা আমাদের সাথে এমন করে ঝগড়া করতে না। চোখ দিয়ে দেখ, আরো কত কি এনেছি আমরা, সুধা বললো।

অতো মটর শুটি দেখে আনন্দে চীৎকার করে উঠলো সবাই। সুধা কিন্তু কাউকে হাত লাগাতে দিলো না। মিস বোটানি তারপর শাঁখালু, মুসাম্বি আর জংলা কুল বের করে দেখালো। হৈ হৈ করে উঠলো সবাই। হাসিনা সবাইকে মটরশুটি ভাগ করে দিলো। একসঙ্গে গোল হয়ে বসে শাঁকালু, নারকেল আর মুসাম্বি দিয়ে মজা করে দুপুরের খাওয়া শেষ হলো। সুখিয়ার কুকুরটা ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগলো। খেতে বসে কেউ কেউ নুনের অভাব বোধ করছিলো। যমুনা বললো, কোন চিন্তা নেই, সমুদ্রের তীরে অনেক নুন আছে, কাল সকালে যেয়ে নিয়ে আসা যাবে। তারপর দোপাট্টার আঁচল থেকে অল্প কিছুটা নুনের গুড়ো বের করেদিলো।

মেরী বললো, বড্ড শীত করছে, একটু আগুন হলে কি ভালোই না হতো।

আচ্ছা ব্যবস্থা করছি। এই বলে পকেট থেকে কয়েক টুকরো পাথর বের করলো ধামুয়া।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলো, ঐগুলো কি?

চকমকি পাথর। কিছু শুকনো ঘাস যোগাড় করে নিয়ে এলো ধামুয়া। তারপর একটা পাথরের টুকরোর সাথে ঘষতে শুরু করলো অন্যটা। কিছুক্ষণ পরে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে পড়ে শুকনো ঘাস পাতায় ঝপ করে আগুন জ্বলে উঠলো। ডালপালা কুড়িয়ে এনে

আগুনে ফেলতে থাকে সবাই। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। অত উঁচু আগুনের শিখা দেখে সুধা, মুন্না, জোসেফ আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচতে শুরু করে। সবাই ধামুয়াকে জিজ্ঞাসা করলো আগুন জ্বালাবার এরকম কায়দা সে কোথা থেকে শিখেছে।

দাদুর কাছ থেকে শিখেছি আমি, ধামুয়া জানালো। আমাদের আদিবাসী গ্রামে প্রায় সবাই এভাবে আগুন জ্বালাতে পারে।

একটা কাজ করলে হয়, কাশেম বললো। সবাই মিলে দুর্গটার চারপাশটা ভাল করে অনুসন্ধান চালানো যাক। এটা তো একটা দ্বীপ। আমাদের হয়ত এখানে অনেকদিন থাকতে হবে। দুর্গটার নীচের ঘরগুলো ঠিক অবস্থায় আছে কিনা তাও একবার দেখা দরকার।

বসন্ত, রোমু, সন্দীপ আর সুখিয়া সবাই অনুসন্ধানের কাজে এক পায়ে খাড়া। মেয়েরা প্রথমে ভয় পেলো, যেতে চাইলো না। তারপর রাজি হলো সবাই। দুদলে ভাগ হয়ে একদল দুর্গের পেছন দিকটায় সমুদ্রের দিকে অনুসন্ধানে গেলো, অন্যদল দুর্গের সামনের দিকের সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে কি আছে দেখতে গেলো।

কৃষ্ণ কোন দলের সাথেই গেল না। ওর কাছে ছোট ছেলেমেয়েরা হাসিনা, মুন্না, মেরী, জোসেফরা রইলো। ঘরে তো কাউকে থাকতেই হবে, কেননা খাবার দাবার রয়েছে। পাহারায় কেউ না থাকলে বাঁদর ও পাখীরা খেয়ে ফেলবে সব।

সন্দীপ, রোমু, কাশেম ও ধামুয়া দুর্গটার পেছনদিকের ভাঙ্গা অংশ দিয়ে নীচে নামছে। গলা ছেড়ে গান গাইছে রোমু।

পাথরের দেওয়ালগুলো ভাঙ্গা। চারদিকে ধ্বংসলীলার চিহ্ন।

সন্দীপ বললো, মনে হয় বহুকাল আগে এখানে একটা খুব জোর যুদ্ধ হয়েছিল। দুর্গের অধিবাসীদের সাথে জলদস্যুদের। জলদস্যুরা জাহাজ থেকে কামান দেগে দুর্গটাকে ধ্বংশ করে দিয়েছিলো।

তারপর জলদস্যুরা নিশ্চয়ই দ্বীপে নেমে দুর্গের আর দ্বীপের বাসিন্দাদের বন্দী করে এবং দ্বীপের দখল নেয়। লুটপাট করে সব ধ্বংস করে দেয়। কাশেম বললো।

জলদস্যুরা যদি পর্ত্তুগীজ হয়, তাহলে তারা এই দ্বীপের অধিবাসীদের বন্দী করে অন্য কোন দেশে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করে দিয়েছিলো। কারণ পর্ত্তুগীজরা দাসব্যবসা চালাতো। মনে করো তারা যদি ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গের লোকজন হয়। সন্দীপ বললো।

ওরা আরও একটু এগিয়ে যায়, দেখে—নীচের সব ঘরই ভাঙ্গা, ধ্বংসস্তুপে ভর্ত্তি। কতকাল হয়ে গেলে, এদিকে কেউ আসেনি নিশ্চয়ই। সব জায়গায় ঝোপঝাড় গাছপালা গজিয়েছে। চিল ও সামুদ্রিক পাখীরা বাসা বানিয়েছে। রোমু হঠাৎ চীৎকার করে সবাইকে ডাকলো। সবাই দৌড়ে যেয়ে দেখে পাথরের খাঁজের মধ্যে একগাদা লোহালক্কর দেখা যাচ্ছে। ওরা সাবধানে সেখানে গিয়ে পৌঁছলো। বল্লমের ভাঙ্গা টুকরো, ভাঙ্গা তরোয়াল, লোহার ডাণ্ডা আরও অনেক কিছু রয়েছে। মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ওর ভেতর থেকে বেছে বেছে ওরা একটা লোহার ডাণ্ডা বের করলো, যেটা দিয়ে শাবলের কাজ বেশ চালানো যাবে। আট দশখানা বল্লমের ভাঙ্গা টুকরো ও একটা আগা ভাঙ্গা তরোয়ালও পাওয়া গেলো।

ধামুয়া বললো, এটা দিয়ে গাছের ডালপালা কাটা যাবে।

হঠাৎ ওরা ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে দেখে, সামনে লোহালক্করের জঞ্জালের মধ্যে বিরাট একটা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। সবাই মিলে শাবল, বল্লমের ভাঙ্গা টুকরো আর তরোয়ালটা হাতে নিয়ে দে ছুট। এক ছুটে একেবারে ওদের ঘরে।

ধামুয়া বললো, ওরে বাবা, খুব বাঁচা বেঁচে গেছি।

এমন সময় হৈ হৈ করে যমুনা, সুধা, মেরি, গুরমুখ ও সুখিয়া ঢুকলো। সুখিয়ার একহাতে মস্ত একটা বালতি, অন্যহাতে বিরাট

একটা থালার মতো পাত্র। গুরমুখের হাতে বিরাট একটা কড়াই, সুখার হাতে একটা জগ আর মেরীর হাতে দুটো হাতা।

আরে এসব কোথায় পেলে তোমরা? বসন্ত জিজ্ঞাসা করলো।

আধ ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে আমরা নীচে নামছি তো নামছিই, সুখিয়া বললো, তারপর দেখি সিঁড়ি শেষ, ঘরটা ভাঙ্গা কড়ি বরগায় বোঝাই, আর এগিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। বৃষ্টির জল মেঝেতে জমে রয়েছে। বিচ্ছিরি ভ্যাপসা গন্ধ। বাদুর আর চামচিকেতে বোঝাই। আমাদের সাড়া পেয়ে ঝপঝপ করে উড়ে পালাতে লাগলো। সাহস করে তবুও এগিয়ে যেয়ে আমরা একটা বিরাট ঘরে ঢুকলাম, সেটা মনে হয় এককালে দুর্গের রান্নাঘর ছিলো। ওখান থেকেই এই পাত্রগুলো পাওয়া গেলো। মনে হয় আরও অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু বেশীক্ষণ আর ওখানে থাকতে ভরসা হলো না।

বাসনপত্র নিয়ে সবাই এবার ঝর্ণার দিকে চললো। হাত লাগিয়ে বাসনপত্রগুলো পরিষ্কার করে ফেললো সবাই। ধামুয়া ভাঙ্গা তরোয়ালটা নিয়ে ধার দিতে বসলো।

এইবার আমাদের সত্যিকারের পিকনিক শুরু হলো। হঠাৎ কৃষ্ণ উৎসাহিত হয়ে বললো।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর আগুনটা ভাল করে উস্‌কে দিয়ে আগের দিনের মতোই শুয়ে পড়লো সবাই। দুজন পাহারাদার দুই দিকে জেগে



রইলো। মাঝরাতে হটাৎ রোমুর চোখে পড়লো ভাঙ্গা ছাদটার উপর দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। ভয় পেয়ে রোমু সুখিয়াকে ডাকলো। সুখিয়া সব পাহারাদারদের ডেকে তুললো। জ্বলন্ত চোখ দুটি ওদের দিকে একভাবে চেয়ে রয়েছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো ওরা। সুখিয়া একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে উঁচু করে ধরতেই জ্বলন্ত চোখের মালিক চিতা বাঘটা গর্জন করে উঠলো। চিতাবাঘের গর্জনে এবং ওদের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙ্গে গেলো সবার। আতঙ্কে বাচ্চারা আর মেয়েরা ঘরের কোনে যেয়ে লুকোলো, কাঁদতে শুরু করলো অনেকে। ধামুয়া, কাশেম, সন্দীপ ও বসন্ত তাড়াতাড়ী সুখিয়ার মতো একটা করে জ্বলন্ত চেলাকাঠ আগুন থেকে তুলে নিয়ে উপরের দিকে উঁচু করে নাচাতে থাকলো। বিকট সুরে চীৎকার চেঁচামেচি করছে সবাই। কাঠের আলোয় চিতাবাঘটাকে এবার পরিষ্কার দেখা গেলো। জ্বলন্ত কাঠের একটা টুকরোকে ধামুয়া চিতাবাঘটার দিকে ছুঁড়ে মারতেই মৃদু গর্জন করে নীল চোখের মালিক অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। পাহারাদাররা এবার ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুমিয়ে পড়তে বললো।

কিন্তু কারও চোখেই ঘুম এলো না ভাল করে। আরও জোরদার করা হলো আগুন। ছাদের দিকে তাকিয়ে আর গল্প করতে করতে ভোর হয়ে এলো।

সকালে প্রথম কাজ হলো প্রচুর শুকনো ডালপালা জোগাড় করা। রাত্রে মস্ত করে আগুন জ্বালতে হবে। রোমু ওর মোটা শরীর নিয়ে গাছের ডাল ধরে ঝুলে পরতেই ডালগুলো পটপট করে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। ভাঙ্গা তরোয়ালটা দিয়েও অনেক ডাল পালা কাটা হলো।

হাতমুখ ধুয়ে খাওয়াদাওয়ার পর ছেলেদের একদল খাবার জোগাড় করতে জঙ্গলের দিকে রওনা হলো। মেয়েরা বালতি, জগ নিয়ে ঝর্ণা থেকে খাবার জল আনতে চললো। আজও ওরা ঝর্ণার পাশের ঝোপ থেকে আরও কিছু মটরশুটি সংগ্রহ করে নিয়ে এলো। সমুদ্রের ধার থেকে যমুনা কিছুটা নুন যোগাড় করলো।

দুপুরে খেতে বসে সবাই আলোচনা করে ঠিক করলো, একটা বাড়ি করতে হবে, বেশ শক্ত পোক্ত করে। রাত্রে যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোনো যায়। জন্তু-জানোয়ার যেন ঘরে ঢুকতে না পারে। ঠিক হলো, দুর্গের বাইরে পাহাড়ের ঢালে একটা সমতল জায়গা বেছে নিয়ে বাড়িটা তৈরী করা হবে।

কিন্তু কেমন করে তৈরী হবে বাড়ি ?

ঘর তৈরী করার কায়দা তো কারও জানা নেই।

ইট বালি সিমেন্ট কিছুই পাওয়া যাবে না এখানে।

কি দিয়ে দেওয়াল হবে, কি দিয়েই বা ছাদ হবে।

একে একে প্রশ্ন করে সবাই।

এই জঙ্গলে শহরের মতো পাকা বাড়ি তৈরী করা যাবে না। আমি কুঁড়ে ঘর তৈরী করতে জানি, যে ঘরে গ্রামের মানুষেরা থাকে। ধামুয়া বললো।

কুঁড়ে ঘরের ছাদ হয় খড় দিয়ে, তুমি এখানে খড় কোথায় পাবে ? জিজ্ঞাসা করে মেরী।

জঙ্গলে কাঠ তো প্রচুর রয়েছে, কেটে আনলেই হবে। কিন্তু খড় পাওয়া যাবে কোথায় ? কাশেম জিজ্ঞাসা করলো।

আমাদের কাছে তো কুড়োল করাত কিছুই নেই। কাঠইবা কেমন করে কাটা যাবে ? হাসিনার প্রশ্ন।

আমার কাছে অবশ্য চমৎকার একটা লম্বা চাকু আছে। কাশেম জানালো।

কেন ! আমাদের কাছে ভাঙ্গা তরোয়ালটা আছে না। ওটা দিয়ে

গাছ কাটা যাবে। ধামুয়া উত্তর দিলো।

সুখিয়া বললো, এখন থেকে আমরা দুটো আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে কাজ করবো। একদল বনজঙ্গল থেকে খাবার দাবার যোগাড় করবে, অন্যদল ঘর তৈরীর চেষ্টা চালাবে।

এ ব্যাপারে এক মত হলো সবাই। কৃষ্ণ এসব আলোচনায় কোন অংশ গ্রহণ করলো না, চুপচাপ বসে সে রেডিও শুনছে।

খাবার সংগ্রহ দলের দায়িত্ব কে নেবে? কাশেম জিজ্ঞাসা করলো।

আমি নেবো, সন্দীপ জানালো।



ঠিকমতো খাবার যোগাড় করতে পারবি তো, নাকি বেশী খাওয়ার লোভে ঐ দলের নেতা হতে চাইছিস্। কাশেম সন্দীপকে রাগাবার চেষ্টা করলো।

হ্যাঁ, শুধু আমি কেন, আমার দলের সবাই বেশী খাবে, আর তোকে কিছুই দেওয়া হবে না, বুঝলি। সন্দীপ হাসতে হাসতে উত্তর দিলো।

সুখিয়া বললো, ঘর তৈরী করার দলের নেতা হোক ধামুয়া। ও যে ভাবে বলবে সেইভাবে আমরা ঘর তৈরীর জিনিসপত্র যোগাড় করবো।

সন্দীপ ওর দলে গুরমুখ, কাশেম, যমুনা, সোনিয়া, কাজলা, শংকর আর ঘনশ্যামকে নিলো। আত্মরক্ষায় জন্য ঘনশ্যাম ভাঙ্গা বল্লমের টুকরো থেকে কয়েকটা নিয়ে সবার হাতে হাতে দিলো। সন্দীপ ওর দলবল নিয়ে খাবার সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে রওনা দিলো।

কাশেমের কাছ থেকে ওর চাকুটা চেয়ে নিলো ধামুয়া।

ধামুয়া বাকি সবাইকে ডেকে বললো, ঘরের ছাদ ছাইবার জন্য এখানে খড় নেই বটে, কিন্তু নারকেল পাতা দিয়ে চাটাই তৈরী করে ছাদ ঢেকে দিতে পারি আমরা। ঘরের চারপাশের দেওয়ালও তৈরী করতে হবে শক্ত ডাল, বাঁশ আর নারকেল পাতার চাটাই দিয়ে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি নারকেল পাতার চাটাই বুনতে পারো ?

আমি এমন পরিপাটি করে চাটাই বুনবো যে বৃষ্টি হলেও এক ফোঁটা জল ভেতরে ঢুকবে না। ছোটবেলায় গাঁয়ের বাড়িতে আমি অনেক চাটাই তৈরী করেছি, বসন্ত জানালো।

আমিও কিছুটা বুনতে জানি, সুখিয়া বললো।

দুটি মেয়ে জানালো তারাও বুনতে জানে। সুধা, হাসিনা ও মেরী বললো, শিখিয়ে দিলে আমরাও বুনতে পারবো।

ধামুয়া বসন্তকে ডেকে বললো, তুই নারকেল গাছে উঠে পাতা কেটে নীচে ফেলতে থাক্। আর মেয়েরা শোনো, তোমরা নারকেল পাতাগুলো কে গুছিয়ে রাখো। কোথায় ঘর তৈরী করা হবে, আমরা সেটা ঠিক করতে যাচ্ছি।

পাহাড়ের ঢালে চমৎকার একটা সমতল জায়গা খুঁজে বের করলো ওরা, যেখান থেকে চারপাশে লক্ষ্য রাখা যাবে। আর জায়গাটা থেকে ঝর্ণাটাও খুব কাছে। ঘরের মাপ ঠিক করে ধামুয়া চার কোনে চারটে ভাঙ্গা বল্লমের টুকরো পুঁতে দিলো। তারপর সবাইকে পাথরের টুকরো নিয়ে আসতে বললো। পাথর দিয়ে ঘরটার ভিত তৈরী করতে হবে। চারপাশ থেকে খুঁজে খুঁজে ওরা হাতে হাতে পাথরের টুকরো এনে জড়ো করলো ওখানে। বেশ কিছু পাথর জমা হলে ধামুয়া বললো, এই থাক, দরকার হলে দুর্গের ধংশাবশেষ থেকে পরে আরও পাথর নিয়ে আসা যাবে। এখন ফিরে চল, চাটাই তৈরীর ব্যবস্থা করা যাক্।

নারকেল বনের কাছে এসে ওরা দেখে, বসন্ত পাতার সাথে সাথে প্রচুর ডাব আর ঝুনো নারকেলও ফেলেছে নীচে। মেয়েরা সব একজায়গায় জড়ো করে রাখছে। বসন্তকে এবার নীচে নেমে আসতে বললো ধামুয়া।

তারপর সবাই মিলে হাত লাগিয়ে নারকেল পাতা, ডাব ও নারকেলগুলো গুছিয়ে রাখলো। সুখিয়া ও বসন্ত মেয়েদের নিয়ে চাটাই বুনতে বসলো আর বাকি সবাইকে নিয়ে ধামুয়া জঙ্গলে রওনা হলো কাঠ কেটে আনার জন্য। সাথে নিলো ভাঙ্গা তরোয়াল আর শাবলটা। যেতে যেতে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়লে ওরা। হটাৎ একটা বনমুরগি তার বাচ্চাকাচ্চাদের নিচে কঁকর কঁক কঁকর কঁক করতে করতে ওদের সামনের ঝোপ থেকে পাশের ঝোপে যেয়ে ঢুকলো। খরগোশরা ওদের দেখে এক দৌড়ে মাটির গর্তে লুকোলো। মস্ত একটা বাঁশ ঝাড় দেখতে পেয়ে ওরা ভাঙ্গা তরোয়াল আর শাবল দিয়ে বাঁশ কাটতে শুরু করলো। অনেক গুলো বড় বড় বাঁশ কেটে কয়েকবার আসা যাওয়া করে ওরা বাঁশগুলোকে ঘর তৈরীর জায়গায় এনে জমা করে ফেললো। শেষবার বাঁশ আনবার সময় বাঁশঝাড়ের মধ্য থেকে হঠাৎ একপাল সজারু বের হয়ে ঝমঝম করতে করতে ছুটে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়লো। বাঁশ কেটে, পরিষ্কার করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আনতে সবারই গা হাত পা ডালপালা আর কাঁটায় ছড়ে গিয়েছে। পরিশ্রান্তও হয়ে পড়েছে সবাই। ধামুয়া বললো, আজ এই পর্যন্ত থাক্, আবার আগামীকাল যাওয়া যাবে। বেলা পড়ে আসছে, না হলে ফিরতে অন্ধকার হয়ে যাবে।



বসন্ত সুখিয়া আর মেয়েরা মিলে অনেকগুলো চাটাই বুনে ফেলেছে। সুধা আর হাসিনা নারকেল ছোবড়া দিয়ে দড়ি তৈরীর কায়দা শিখে দড়ি পাকাতে বসেছে।

সবাই মিলে ওরা গল্পসল্প করছে, এমন সময় হৈ হৈ করে সন্দীপ আর তার দলবল জঙ্গল থেকে ফিরলো। কাশেম আর গুরমুখের হাতে বিরাট বিরাট দুটো পাকা কলার কাঁদি। যমুনা ওর দোপাট্টায় বেঁধে এনেছে একরাশ কাজুবাদাম। শঙ্কর আর ঘনশ্যামের হাতে প্রচুর শাঁকআলু, ভাঙ্গা বল্লমের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে বের করেছে ওরা। সোনিয়া আর কাজলা এনেছে ডালিম আর মিষ্টি লেবু।

ঝর্ণার জলে মুখ হাত ধুয়ে দুর্গের দিকে চললো সবাই। আগুনের মধ্যে ডালপালা ফেলে দিতেই জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আগুনের পাশে গোল হয়ে ওরা গল্প করতে বসলো। সন্দীপরা জঙ্গলে কি দেখেছে তার গল্প শুরু করলো। ওরা আজ পূব দিকে গিয়েছিলো কিন্তু দ্বীপটার শেষ দেখতে পায় নি। গভীর জঙ্গল ওদিকে।

আমার খুব খিদে পেয়েছে। মেরী জানালো।

মেরির কথা শুনে সবারই পেটে খিদে চমমন করে উঠলো। অন্ধকার গভীর হয়ে গেলে খাওয়া দাওয়া করতে অসুবিধা হবে।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আরও একটা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে ওরা ঘুমোতে গেলো। আজ তিন দলে ভাগ হয়ে পাহারা বসলো। কৃষ্ণর রেডিয়ো চলছে। গান ভেসে আসছে। কিন্তু রেডিয়ো থেকে ওদের সম্বন্ধে কোন খবরই শুনতে পায়না ওরা। রাত গভীর হয়। ঘুমিয়ে পড়ে সবাই। পাহারাদাররা শুধু জেগে। আজ রাতে আর কোন জ্বলন্ত লাল চোখের দেখা পাওয়া গেলো না। মাঝে মাঝে শুধু শেয়ালের চীৎকার আর অজানা জন্তুর ডাক ও চলাফেরার শব্দ পাওয়া গেলো।

সকালে উঠে ঘর তৈরী দলের ছেলেমেয়েরা কাজে লেগে পড়লো।

শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে বাড়ির সীমানা ধরে বাঁশের খুঁটি পুঁতে ভেতরে পাথর দিয়ে ভিত তৈরী করতে থাকে সুখিয়া আর

ধামুয়া। মেয়েরা চাটাই বুনতে আর দড়ি পাকাতে থাকে। ধামুয়া সন্দীপকে ডেকে বলে, আজ ঘর তৈরীর কাজে তোর দলের মেয়েদেরও লাগাতে হবে। ওরা চাটাই তৈরী করবে, ঘর ছাইতে অনেক চাটাই লাগবে।

কাশেম, গুরমুখ আর শঙ্করকে নিয়ে সন্দীপ খাবার সংগ্রহের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো। আজ ওরা দ্বীপের দক্ষিণ দিকে যাবে।

ঘরের জন্য মোটামোটা পাঁচটা খুঁটি লাগবে, চারদিকে চারটে আর মাঝখানে একটা। বসন্ত মেয়েদের নিয়ে এখানে চাটাই এর কাজ করুক, আমরা জঙ্গলে যাই চল্। ধামুয়া বললো।

সবাই চললো গভীর জঙ্গলের দিকে। অতিকষ্টে কোনরকমে ওরা



সোজা দেখে দুটো গাছ কাটতে পারলো। গাছ কেটে হাঁফিয়ে পড়লো সবাই। জঙ্গলের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ওরা। নিস্তব্ধ জঙ্গলের শান্তি ভঙ্গ হওয়ায় মাথার উপরে পাখীরা নানা স্বরে কলরব করতে করতে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাঁদররা এ গাছ থেকে ও গাছে হুপহাপ করে লাফাচ্ছে। হরিণরা ওদের সাড়া পেয়ে দৌড়ে পালালো। কিছুক্ষণ পরে সবাই মিলে ধরাধরি করে একটা গাছকে বয়ে নিয়ে আসে ওদের নতুন ঘরের কাছে। ওদের পক্ষে ছোট ছোট ডালপালা কাটা সম্ভব, কিন্তু এত বড় বড় গাছকাটা খুবই কষ্টের ব্যাপার। আবার ফিরে যেয়ে ওরা অন্য গাছটাকেও বয়ে নিয়ে আসে। ওদের শক্তি একেবারে নিঃশেষ। মাটিতে শুয়ে পড়ে ক্লান্তিতে।

এখনও আরও তিনটে খুঁটির দরকার, দুটো ছোট আর একটা বড়।

সন্দীপ ও তার দলবল ফলমূল নিয়ে ফিরে আসে। আজ ওরা দক্ষিণে গিয়েছিলো, কিন্তু দ্বীপের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারেনি। ওরা প্রচুর সবেদা আর বনকুল নিয়ে এসেছে। জঙ্গলের মধ্যে বেশ বড় একটা পুকুর আবিস্কারের করেছে ওরা। একটা ঝর্ণা এসে পড়েছে তাতে। জলটা খুব মিষ্টি। চারদিকে টিলা, মাঝখানে পুকুরটা। মাঝে মাঝে ঘাস আর শেওলা জমে আছে। পাথরগুলোও খুব পিছল।

এ আর এমনকি আবিস্কার করেছো। আমরা প্রথমদিনই কি সুন্দর একটা ঝর্ণা খুঁজে পেয়েছিলাম। তার পাশে আবার চমৎকার একটা মটরশুটির খেত। সুধা মুখ ভেংচে বললো।

আরে শোন না, আমরা ওখানে কি আবিস্কার করেছি, কাশেম বললো। ওখানে একটা বাচ্চা হাতি রয়েছে। মনে হচ্ছে হাতিটা জল থেকে উঠতে পারছে না।

বাচ্চা হাতি! কি মজা, কি মজা, হাসিনা খুশির স্বরে বললো।



মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠলো, আমাদের একটু দেখাতে নিয়ে চলো না।

কাজকর্ম ফেলে সবাই মিলে হাতির বাচ্চা দেখতে চললো। কাজলা, সুধা আর শংঙ্কর মহা উৎসাহে আগে আগে চলেছে, হটাৎ শংঙ্কর চীৎকার করে কাজলাকে থামতে বললো। কাজলা আর সুধা দাঁড়িয়ে পড়তেই শঙ্কর দেখালো, সামনে ঘাসের মধ্যে মস্ত একটা সাপ এঁকে বেঁকে চলেছে।

সাপটা চলে যেতেই ওরা আবার চলতে থাকে। জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে পথ। কিন্তু কেউ

আর সেই পাহাড়ী ঝর্ণা আর পুকুর খুঁজে পায় না। হটাৎ একটা কোঁয়াক, কোঁয়াক ডাক শুনে কাশেম বলে ওঠে, ঐ তো হাতির বাচ্চার ডাক।

অবশেষে ওরা পৌঁছলো সেখানে। ছোট্ট একটা হাতির বাচ্চা ডুবে রয়েছে জলের মধ্যে, শুধু পিঠ মাথা আর শুঁড় দেখা যাচ্ছে। উঠতে পারছে না, পাঁকে বোধহয় পা আটকে গেছে। আতঙ্কে চীৎকার করছে। মাকে ডাকছে।

বাচ্চাটা মরে যাবে, জোসেফ বললো।

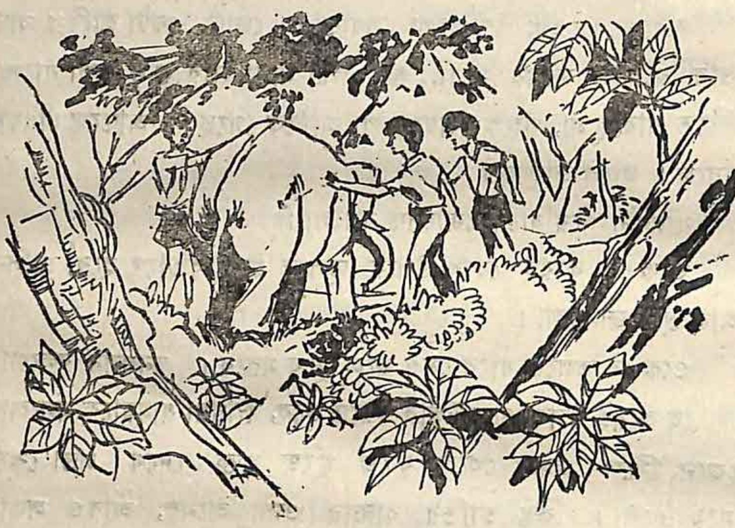
ওকে যে করেই হোক উপরে তুলতে হবে, বাঁচাতে হবে, হাসিনা আর সুধা জানালো।

ওকে যে তুলতে যাবে সেও জলে ডুবে মরবে। ঘনশ্যাম বললো।

যে করেই হোক ওকে উদ্ধার করতে হবে, সুখিয়া ধামুয়াকে বললো। দুজনে মিলে জঙ্গল থেকে খুঁজে খুঁজে শক্ত দেখে লতা কেটে নিয়ে এলো। কিন্তু হাতির বাচ্চার ওজন অনেক, আরও লতার দরকার। সবাই মিলে খুঁজে খুঁজে আরও অনেক লতা নিয়ে এলো। হাতির বাচ্চা উদ্ধারে মেতে উঠলো সবাই। লতাগুলো একসঙ্গে পাকিয়ে শক্ত রশি তৈরী করা হলো। ধামুয়া রশি দিয়ে ফাঁস তৈরী করে হাতিকে আটকাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। সুখিয়াও অনেক চেষ্টা করে পারলো না।

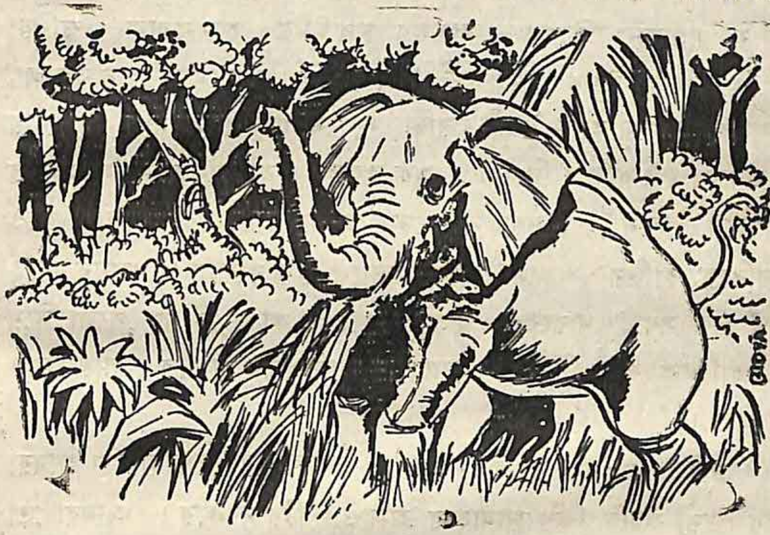
ঘনশ্যাম সবার চেয়ে লম্বা। সে হাতিকে উদ্ধার করতে জলে নামলো। কিন্তু সুখিয়া বললো, ঘনশ্যাম তোমার কোমরে আগে একটা দড়ি বেঁধে দিই। হটাৎ যদি তুমি জলে পড়ে যাও, তাহলেও তোমাকে বাঁচাতে পারবো। কাশেম ও গুরমুখও কোমরে দড়ি বেঁধে জলে নামতে রাজী হলো। ওরা তিনজন মোটা রশিটা হাতির বাচ্চার পেটে বেঁধে টানতে লাগলো। অনেক কষ্টে বাচ্চাটাকে কাদা থেকে তোলা সম্ভব হলো। এবার ওকে তীরে তুলতে হবে। কিন্তু বাচ্চাটা পেটে দড়ি বাঁধাতে বেজায় ভয় নিয়ে চীৎকার করতে শুরু করলো।

ওতো আর জানে না যে ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, আর হতভাগা কোনদিন মানুষ দেখে নি, মানুষ দেখে ভয়ও পেয়েছে ভীষণ। সবাই মিলে টানতে বাচ্চাটাকে তীরে তোলা হলো। এতো বাচ্চা হাতি



আগে কোনদিন দেখে নি ওরা। জল দিয়ে ওর গায়ের কাদামাটি ধুয়ে দিলো। ওর গায়ে হাত বুলিয়ে সবাই আদর করতে লাগলো। কলাগাছের পাতা এনে ধামুয়া ওর মুখের কাছে ধরলো। বাচ্চাটা ওদের সাথে খেলায় মেতে উঠলো। হঠাৎ এক ভয়াল গর্জন শুনে ওরা পেছন ফিরে দেখে বিরাট একটা হাতি বনজঙ্গল ভেঙ্গে ছুটতে ছুটতে আসছে। শুঁড়টা ওপর দিকে গোটানো, বাচ্চাটার কাছে এসে থামলো হাতিটা। কালোমাটির মতো গায়ের রঙ, কানদুটো কাঁপছে, চোখ দুটো রাগে লাল। সুখিয়া ছাড়া সবাই ছুটে পালালো জঙ্গলের আড়ালে। অবাক বিস্ময়ে সুখিয়া চেয়ে রইলো বড় হাতিটার দিকে। প্রাণ কাঁপানো চীৎকার করে হাতিটা তার সামনের পা তুললো আর শুঁড় নামিয়ে আনলো। জঙ্গলের আড়াল থেকে সবাই ভাবলো, হাতিটা নির্ঘাত এবার সুখিয়াকে পা দিয়ে চেপ্টে দেবে না হলে শুঁড়ে তুলে আছাড় মারবে। মেয়েরা, বাচ্চারা ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো।

সুখিয়া কোন ভয় না পেয়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড করলো। দু-হাতে হাতির বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে মা-হাতিটার চোখের



দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি আমাদের উপর রাগ করছো কেন মা। আমরা তো তোমার বাচ্চার কোন ক্ষতি করিনি, বরং ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি। ওকে চান করিয়ে পরিষ্কার করে ওর সাথে খেলা করছি। আমরাও তো তোমার বাচ্চার মতো মা।

হাতির বাচ্চাটাও ওর মার কাছে এগিয়ে যেয়ে মার শুঁড়ে শুঁড় লাগিয়ে কি যেন বললো। তারপর আবার সুখিয়ার কাছে ফিরে এসে ওর গায়ে শুঁড় বুলিয়ে আদর করলো।

মা-হাতিটা এবার পা নামিয়ে বাচ্চাটার সারা গায়ে শুঁড় বুলোতে লাগলো। বাচ্চাটা একছুটে গিয়ে চুক্ চুক্ করে মার দুধ খেতে লাগলো।

শুঁড় নামিয়ে মা হাতিটা সুখিয়াকে জড়িয়ে ধরে একটানে ওর পিঠে তুলে নিলো। জঙ্গলের আড়াল থেকে সবাই ভাবলো এবার সুখিয়ার মৃত্যু নিশ্চিত। সুখিয়াও হাতির এই ব্যবহারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। তারপর কিছুই হলো না দেখে বুঝতে পারলো, মা হাতি তাকে

ভালবেসে এখানে বসিয়েছে। আনন্দে ছুহাত তুলে সে টার্জানের মতো চীৎকার করে উঠলো। ওকে পিঠে নিয়ে মা-হাতি বাচ্চাটাকে সাথে নিয়ে পাহাড়ের দিকে ঘন জঙ্গলের পথে হাঁটতে শুরু করলো। সুখিয়া হাতির পিঠের উপর শুয়ে পড়ে মুখটা কানের কাছে নিয়ে যেয়ে বললো, আমরা যেখানে বাড়ি তৈরী করছি, সেখানে একটু চলো মা। সুখিয়ার দেখানো পথ ধরে হাতি চলতে শুরু করলো। বাচ্চাটাও চললো মায়ের পেছনে পেছনে। এই দৃশ্য দেখে ছেলেমেয়েরাও ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে হাতির পেছনে পেছনে চলতে শুরু করলো। ঘরের কাছে পৌঁছলে সবাই নারকেল, ফলমূল হাতের কাছে যে যা পেলো নিয়ে মা-হাতিকে খেতে দিলো। বাচ্চাটা সবার সাথে আবার খেলায় মেতে উঠলো।

সুখিয়া মা-হাতির কানে কানে বললো, মা দেখছো তো আমরা ঘর তৈরী করছি, কিন্তু আমাদের আরও খুঁটির দরকার। আমরা তো ছোট, আমাদের কাছে করাত, কুড়োল কিছুই নেই, আমরা কি করে মোটা মোটা খুঁটি কাটবো। তুমি আমাদের কয়েকটা গাছ উপড়ে দাও। তাহলেই আমাদের ঘর তৈরী হয়ে যাবে।

সুখিয়ার কথা শোনার পরে মা-হাতি কি বুঝলো বোঝা গেলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে চললো জঙ্গলের দিকে, পেছন পেছন চললো সবাই। জঙ্গলের গভীরে যেয়ে সুখিয়ার অনুরোধ অনুযায়ী চার পাঁচটা বড় গাছ শুঁড় লাগিয়ে উপড়ে ফেললো। ছেলেমেয়েরা হাততালি দিতে লাগলো আনন্দে। তারপর শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে সুখিয়াকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে মা-হাতি ছু বার ডাক ছেড়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলো।

ওদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেলো। সবাই মিলে ডালপালা কেটে গুঁড়িগুলোকে ঘর তৈরীর জায়গায় নিয়ে এলো। শুরু হয়ে গেলো পুরোদস্তুর ঘর তৈরীর কাজ।

তৈরী হয়ে গেলো বাড়ি। বেশ বড় সড় বাড়ি, একদিকে ছেলেদের

শোবার ঘর, অন্যদিকে মেয়েদের। একটা পড়াশোনা করার লাইব্রেরী ঘর। একটা রান্না আর খাবার ঘর। বাঁশ, কাঠ আর চাটাই দিয়ে তৈরী করা হয়েছে চারপাশের দেওয়াল। দরজাও করা হয়েছে বেশ শক্ত পোক্ত করে।

নতুন বাড়িতে আজ গৃহপ্রবেশ হবে। মেয়েরা শুকনো কলাপাতা, রঙ বেরঙের ফুল পাতা দিয়ে পতাকা, মালা তৈরী করলো। ঘরের মাথায় লাগানো হলো সবচেয়ে বড় পতাকা। বাড়ির মূল দরজা আর প্রত্যেকটা ঘর ফুল মালা দিয়ে সাজানো হলো। মেঝেতে দেওয়া হলো আলপনা। সবাই ঝর্ণায় স্নান করে পরিষ্কার হয়ে নতুন বাড়ির সামনে এসে জমায়েত হলো। ঘনশ্যাম সবার আগে ঘরে ঢুকতে চাইলো, কিন্তু হাসিনা তাকে বাধা দিয়ে বললো, থামো, আগে এই নতুন বাড়িটার একটা নাম দেওয়া যাক, তারপর ঘরে ঢোকা যাবে।

হ্যাঁ এটা ঠিক, তাহলে ঠিক করো কি নাম রাখা হবে বাড়িটার। সুখিয়া বললো।

এ আর কঠিন কি। এর নাম রাখলাম শেঠ ঘনশ্যাম প্যালেস। ঘনশ্যাম বলল।

ইস্ কোথাকার কোন শেঠরে আমার। এই বাড়ির নাম হবে রোমুভিলা। রোমু তার দাবি জানালো।

না এটার নাম হোক বসন্ত বিহার। বসন্ত বললো।

সবচেয়ে ভাল নাম হলো, কাশেম মঞ্জিল। কাশেম এগিয়ে এসে বললো।

লেগে গেলো তর্কতর্কি। কেউ তার দাবী ছাড়বে না। আরও নতুন নতুন নাম পেশ হচ্ছে।

সুখিয়া চিৎকার করে বললো, কি হচ্ছে এসব। আজকের এই শুভদিনে তোমাদের এরকম করতে লজ্জা করছে না। চুপ কর তোমরা।

সবাই সমস্বরে বললো, সুধা যা বলবে ঘরের নাম তাই হবে।

এর মধ্যে মেরী প্রস্তাব করলো, আমাদের সবার মেহনতে তৈরী

এই বাড়ির নাম হোক—'আমাদের বাড়ি'।

সবাই এই প্রস্তাবে সমর্থন করে একবাক্যে চীৎকার করে উঠলো, 'আমাদের বাড়ি'।

নাম করণের পর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইলো, সবাই তারপর প্রবেশ করলো নতুন বাড়িতে।

আজ থেকে মেয়েরা রান্না শুরু করলো। খাবারের মেনু আজকে অন্য রকম। নানা রকমের ফল, তার সাথে মটরশুটির তরকারী, নারকেলের নাড়ু আর চাটনি। সবাই একসাথে বসে গল্প করতে করতে পেট ভরে খাবার খেলো। কেউ কেউ বাইরে এসে ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

হাসিনা বললো। আজ কিন্তু আমরা চমৎকার খেয়েছি।

আমরা আজকে নিজেদের তৈরী ঘরে বসে সবার পরিশ্রমে তৈরী খাবার খেয়ে দারুন তৃপ্তি পেয়েছি, তাই না বসন্ত। কাশেম বললো।

না, না, শুধু তৃপ্তি পেয়েছি বললে ভুল হবে, বল খুব আনন্দ পেয়েছি। বসন্ত বললো।

তাহলে বল আনন্দ নয়, বেজায় মজা পেয়েছি। কাশেম বললো।

না, না আনন্দ। বসন্ত বললো।

আরে রাখ ভাই, ঠিক করে বলতে গেলে বলো, আমরা আজকে স্ফূর্তি করেছি, চমৎকার এন্‌জয় করেছি। রোমু বললো।

এই রোমু, তুই আমাদের কথার মধ্যে কথা বলছিস্ কেন রে? বসন্ত বললো।

আরে তোরা তর্ক করছিস্ দেখে আমি বললাম। রোমু উত্তর দিলো।

আমরা তর্ক করি, মারামারি করি, তাতে তোর কি? এটা আমাদের অধিকার। তুই কেন আমাদের মধ্যে কথা বলবি? বসন্ত রেগে বললো।

না, না, অধিকার নয় এটা আমাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা। কাশেম বললো।

বলছি অধিকার। বইতে পড়িসনি ? বসন্ত বললো।

ফের যদি আমার কথার প্রতিবাদ করবি তাহলে তোকে পিটিয়ে আমসত্ব বানাবো। কাশেম বললো।

আরে আমার কোথাকার শের খান এলেন রে। বসন্ত বললো।

মেরী বললো, কোন শের খান ?

শের খান নয়। শেরশাহ, যিনি বাংলা থেকে আফগানিস্থান পর্যন্ত সড়ক তৈরী করেছিলেন। শঙ্কর বললো।

ও সড়ক তো ইংরেজরা তৈরী করেছে। কাশেম বললো।

আরে আমার সাহেবের বাচ্চারে। আমাদের দেশে ইংরেজ আসবার আগে কি কোন রাস্তাঘাট ছিলো না। গুরমুখ বললো।

আরে তুই নিজে তো একটা বাঁদর বাচ্চা, কিচ্ছু জানিস না শুধু বকবক করিস। কাশেম বললো।

তোর নাক ভাঙ্গব আমি। আমাকে বাঁদর বাচ্চা বললি কেনরে তুই ? গুরমুখ বললো।

আরে ভাই এতে লড়াই তর্কের কি দরকার। আমাদের জীববিজ্ঞানের বইতে লেখা আছে দেখনি। আমাদের পূর্বপুরুষরা বাঁদর ছিলো। সবার বাবার বাবা তার বাবা তার বাবারা বাঁদর ছিল। বাঁদর থেকেই তো আমরা মানুষ হয়েছি।

তোরা সবাই শোন। রোমু সবার বাবাকে বাঁদর বলেছে। বসন্ত বললো।

ওর মাথায় একটা কষে গাট্টা লাগিয়ে দেনা, কাশেম বলে।

বসন্ত রোমুকে মারতে যেতেই, রোমু চীৎকার করে সন্দীপকে ডাকলো। সন্দীপ এসে বললো, তোরা কি শুরু করেছিস, ছোট ছেলের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না তোদের ?

এদিকে কাশেম আর গুরমুখ মারামারি করার পায়তাড়া করতে থাকে।

ওদিকে সুধা, হাসিনা আর মেরী তর্কাতর্কি শুরু করেদেয়।

সন্দীপ এগিয়ে যেতেই বসন্ত চীৎকার করে ঘনশ্যাম কে ডাকে।

সুখিয়া চীৎকার করে বলে, তোরা আজকের দিনে কি আরম্ভ করেছিস বলতো, মারামারি থামা বলছি।

কিন্তু কারো কথা কেউ শোনে না, সবাই হৈ চৈ চীৎকার চেঁচামেচি করছে। দস্তুরমতো হাতাহাতি চলছে। মেয়েরাও পরস্পরের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। কারও কোন কথা শোনা যাচ্ছে না।

সুখিয়া তর্কাতর্কির মধ্যে না যেয়ে ধামুয়া, কৃষ্ণ ও অন্যান্যদের ডাকতে যাবে, টিলার উপরে উঠতেই হটাৎ ওর চোখে পড়ে—সমুদ্রের মধ্যে একটা স্টীমারের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে দূরে দিকচক্রবালে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে সে নীচে নেমে এসে চীৎকার করে বলে—জাহাজ, জাহাজ। তারপর সমুদ্রতীরের দিকে ছুটতে থাকে চীৎকার করতে করতে।

ছেলেমেয়েরা মারামারি ঝগড়াঝাঁটি ভুলে এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকে, তারপর সবাই হাত তুলে চীৎকার করতে করতে সুখিয়াকে অনুসরণ করে। একটা লাঠির মাথায় জামাটা খুলে সুখিয়া পতাকার মতো নাড়াতে থাকে। সমুদ্রের মধ্যে নেমে যায় সব ছেলেমেয়েরা। সবাই গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে স্টীমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে।

আমাদের নিয়ে যাও। আমরা এখানে পড়ে রয়েছি। আমাদের জাহাজ ডুবে গেছে। বাঁচাও আমাদের। সমস্বরে চীৎকার করে বলে সবাই।

কেউ বলে, স্টীমার আমার বাবা তোমাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেবে। তুলে নিয়ে যাও আমাকে। কেউ বলে, আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো স্টীমার, লাড্ডু খাওয়াবো তোমাকে।

সুধা হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কত করে ডাকলো। কিন্তু স্টীমার কারও কথা না শুনে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো দিগন্তে।

হতাশ হয়ে ওরা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ছোট্ট

মেয়ে মেরী বালির উপর শুয়ে কাঁদতে লাগলো। স্টীমার, আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো। আমি মার কাছে যাবো। মেরীর কান্না শুনে সবার মনে ভারী কষ্ট হতে লাগলো। পড়ন্ত রোদে গাছপালা সমুদ্র বেলাভূমি ঝকঝক করছে। দূরে কোথায় একটা পাখীর একটানা ডাক শোনা যাচ্ছে। শঙ্খচিল গুলো মাছ ধরবার জন্য মাঝে মাঝে ছোঁ মারছে ঢেউএর মাথায়।

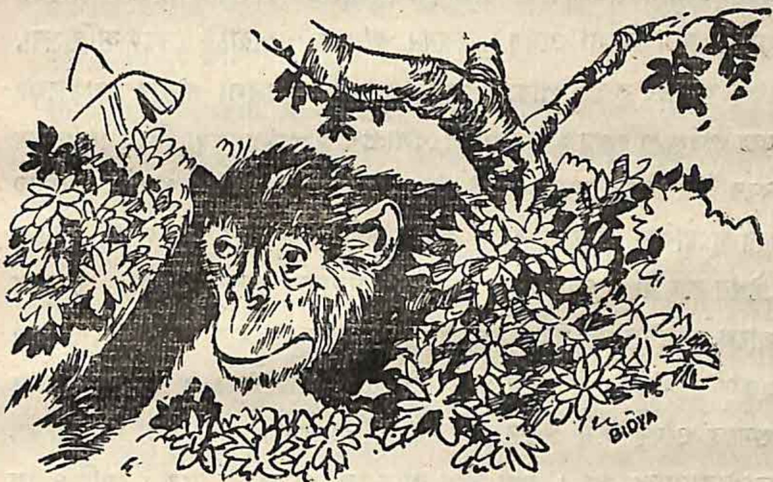
বাড়ি তৈরী হবার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ছেলেমেয়েরা দ্বীপে নির্বাসন জীবন যাপনে বেশ অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। বাড়ির লাইব্রেরী



ঘরে ওরা একটা স্কুল খুলেছে। সেখানে উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা নীচের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের পড়াতো। মেয়েরা লেখাপড়া ছাড়াও রান্না ও অন্যান্য ঘরের কাজ করতো মিলে মিশে। ছেলেরা খাবার জোগাড় করা, জল বয়ে আনা আর কাপড় পরিষ্কারের কাজ করতো। যারা ডুবন্ত স্টীমার থেকে জামা কাপড়ের ব্যাগ আনতে পারে নি, অন্যরা তাদের বাড়তি জামাকাপড় দিয়ে সাহায্য করছে। তা সত্বেও অনেকেরই জামা কাপড়ের খুব খারাপ অবস্থায় এসে পৌঁছেচে। একরকম গাছের আঁশ কাপড়ের মতো বুনে মেয়েদের ঘাগড়া আর জামা এবং ছেলেদের লুঙির মতো পোষাক তৈরী করা হয়েছে। সুঁচ সূতোর বদলে ওরা বড় কাঁটা আর একরকমের সরু অথচ শক্ত লতা দিয়ে কাজ চালাতে লাগলো। জংলা ফুল ও ফলের রঙ দিয়ে পোষাক রাঙাতো ওরা। সুখিয়া প্রত্যেকের জন্য কাঠের খড়ম জাতীয় চমৎকার চটি তৈরী করে দিলো। জঙ্গলের এবরো-খেবরো কাঁটা-ভরা পথে খুব কাজে লাগতো ওগুলো।

সুখিয়ার কুকুরটা এর মধ্যে বেশ তাগড়াই হয়ে উঠেছে, বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে একা একাই শিকার ধরে খায়। জঙ্গলের মধ্যে চলাফেরায় ছেলেমেয়েরা এমন অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে যে দেখলে মনে হয়ে যেন ওরা এখানেই সারা জীবন ধরে আছে। নারকেল গাছ উঠতে শিখে গিয়েছে সবাই। যমুনা আর ধামুয়া জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ জংলা ধান আর গমের ক্ষেত আবিষ্কার করলো। মনে হয় দ্বীপে যখন লোকবসতি ছিলো, তখন তারা এই গম ও ধানের চাষ করতো। সেই ধান গম পেকে গেলে ওরা তুলে এনে খাবার জন্যে বাড়িতে মজুত করলো।

কিছু ধান গমের দামা ঝর্ণার ধারের মাটিতে চাষ করে পুঁতে দিলো। ধামুয়ার কাছ থেকে ওরা সমস্ত জাতের বন্য জন্তুর ডাক এবং তাদের পায়ের চিহ্ন চিনতে শিখে গেলো। বাঁদররা ওদের বন্ধু হয়ে উঠলো। কোন হিংস্র জন্তু ওদের ঘরের দিকে এগোলই বাঁদররা কিচ্‌মিচ্‌ করে ওদের সাবধান করে দিতো।



পাহাড়ের মাথায় অনেক জংলা ছাগল চড়ে বেড়াতো। সুখিয়া, বসন্ত, সন্দীপ, কাশেম ও ঘনশ্যামকে সাথে নিয়ে ধামুয়া একদিন ফাঁদ পেতে দুটো ছাগল ধরলো। বেশ কয়েকদিনের চেষ্টায় ওরা বেশ কয়েকটা ছাগল বাচ্চাকাচ্চা সমেত পাকড়ে ফেললো। বাঁশ আর কাঠ দিয়ে খুব শক্ত করে একটা খাঁচাঘর তৈরী করে তাতে রাত্রে ছাগলের পালকে রেখে দেওয়া হতো আর দিনের বেলায় গলার দড়ি বেঁধে পাহাড়ে ঘাসবনে চড়াতে নিয়ে যাওয়া হতো। প্রচুর দুধ পাওয়া যেতে লাগলো ওদের কাছ থেকে।

কৃষ্ণ কিন্তু কোন কাজ করতো না। চুপচাপ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতো। এর ওর কাছ থেকে ভাল জিনিসগুলো কেড়ে খেতো। কথায় কথায় গায়ের জোর দেখাতো। সবাই মিলে বুঝিয়েও ওর

স্বভাবের পরিবর্ত্তন করানো গেল না। ওর বোন সুধাও ওকে অনেক করে বুঝিয়েছে, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। যেহেতু সুধা খুব ভাল, সবার আদরের পাত্রী, সেইজন্য কেউ কৃষ্ণকে কিছু বলতো না। তবে কৃষ্ণর কাছ থেকে একটা উপকার পাওয়া যেতো, ওর রেডিও মারফৎ সবাই দেশের সব খবর জানতে পারতো। শুনতে পেতো দেশ বিদেশের খবর ও গান বাজনা। একমাত্র কৃষ্ণর রেডিওর মাধ্যমে বাইরের জগতের সাথে যোগ ছিলো ওদের। কেমন করে যে দিনরাত্রি কেটে যাচ্ছিলো, কেউ অনুভব করতে পারতো না। সারাদিন ছবেলা খাবার জোগাড়ের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম আর রাতের বেলাপ্রশান্ত ঘুমের মধ্যে দিয়ে যে কেমন করে দিন কেটে যেতো টেরই পেতো না ওরা। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমোবার আগে সবাই কৃষ্ণর রেডিওর পাশে জমা হতো, রেডিও ষ্টেশন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত রেডিওর অনুষ্ঠান শুনতো ওরা। দেশের সাথে, মানুষজনের সাথে সম্পর্ক রাখার একমাত্র মাধ্যম ছিলো রেডিও। হতাশার মধ্যেও আলোর রেখা চিক চিক করে উঠতো। রেডিও শুনতে শুনতে ওদের মনে পড়ে যেতো বাড়ির কথা, মনে পড়তো বাবা মা, ভাইবোনদের মুখ। জল ভরে আসতো ওদের ছচোখে। রেডিও বন্ধ হয়ে হয়ে গেলেও চুপ করে বসে থাকতো ওরা। কেউ কেউ চোখ মুছতে মুছতে শুতে যেতো।

একদিন রাত্রি বেলা খাওয়াদাওয়ার পর রেডিও শুনছিলো সবাই। বাঁশের বাঁশী বাজাচ্ছে ধামুয়া। হঠাৎ একটা ঘোষনা শুনে চমকে উঠলো সবাই। জড়ো হয়ে বসলো এক জায়গায়। ঘোষক বললো, আকাশবাণী বোম্বাই থেকে বলছি। কিছুদিন পূর্বে রুস্তমজী হাইস্কুলের যেসব ছাত্রছাত্রীরা সমুদ্রঝড়ে জাহাজডুবি হয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে, অনেক খোঁজাখুঁজি করে এখনও পর্যন্ত তাদের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি। অনুসন্ধানের কাজ এখনো চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েরা যে যেখানেই থাকুক, সেই ছেলেমেয়েদের পিতামাতারা এখন তাদের কাছে কিছু কথা বলবেন এবং শুভেচ্ছা জানাবেন।

যারা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো তারা হুড়মুড় করে রেডিওর পাশে এসে বসলো। সবার পিতামাতারা একে একে ওদের উদ্দেশে তাঁদের শুভেচ্ছা এবং গভীর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কথা জানালেন। কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন অনেকে। তাদের ছেলেমেয়েরাও এই সুদূর নির্জন দ্বীপে এই খবর শুনতে শুনতে গভীর আনন্দে ও দুঃখ কখনো কাঁদলো কখনো হাসলো। অনুষ্ঠান শেষে ঘোষক আবার জানালো, ছেলেমেয়েরা তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় থাকো হতাশ হয়ো না। সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো। নানাভাবে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। আশাকরি শীঘ্রই তোমরা বাড়ি ফিরতে পারবে।

রেডিও বন্ধ হয়ে গেলেও নিজেদের পিতামাতার গলার আওয়াজ শুনে উল্লসিত ছেলেমেয়েরা আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো। অনেকদিন পর আজ প্রফুল্ল মন নিয়ে ঘুমোতে গেলো ওরা। না, ওদের কথা কেউ ভুলে যায় নি। বাড়ি ফিরতে পারবে এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো ওরা।

এরপর থেকে সবসময় উন্মনা হয়ে থাকতো ওরা, এই বোধহয় কোন জাহাজ দেখা যায় বা কোন প্লেন উড়ে আসে। কোথাও কিছু আওয়াজ হলেই এক ছুটে ওরা ফাঁকা জায়গায় চলে যেতো, কিন্তু কিছুই নয়। কয়েকদিন এই ভাবে কেটে যাবার পর আবার ওরা ওদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মনোযোগ দিলো। আবার পূর্বের মতোই জীবন কেটে যেতে থাকে। রোজ সন্ধে বেলা গান কবিতা ও গল্পপাঠের আসর বসে। কেটে যায় সময়। এবার ওরা জাহাজ বা প্লেনের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য দুর্গের একদম চূড়োর উপরে বেশ বড়ো করে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরী করলো। তাতে সবসময় কাঠ কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখতো ওরা, যাতে অনেক দূর থেকে বুঝতে পারা যায় এখানে মানুষ আছে এবং তারা সাহায্য চায়।

একদিক বিকেলবেলা, সূর্য তখন প্রায় অস্ত যাচ্ছে, যমুনা, কাজলা,

সুধা আর হাসিনা কাঠকুটো নিয়ে দুর্গের ওপরে উঠেছে, সাথে সুখিয়ার কুকুরটা। মেয়েরা যখন যেখানে যায় তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যায় কুকুরটা। হঠাৎ কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শুরু করলো। ওরা তাকিয়ে দেখে, একটা চিতাবাঘ দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে লেজ নাড়াচ্ছে আর রক্তচক্ষু মেলে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বাঘটার বিকট ডাক শুনে হাসিনা চীৎকার করে কাঁদতে সুরু করলো। সুধা, কাজলা, যমুনা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে,—বাঘ এসেছে, বাঁচাও বাঁচাও, বলে প্রাণপনে চীৎকার শুরু করে দিলো। বাঘটা যতবার মেয়েদের দিকে লাফ মারতে যায়, ততবারই কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘটার উপর। বাঘের থাবায় কুকুরটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিলো। সারা গা দিয়ে রক্ত পড়ছে, তবুও বাধা দিতে ছাড়ছে না। কুকুরের ডাক আর মেয়েদের চীৎকারে সব ছেলেরা যে যেখানে ছিলো ছুটে এলো। ধামুয়া, বসন্ত, গুরমুখ ছুটে এসে বাঘটার গায়ে বড় বড় পাথর ছুঁড়ে মারতে শুরু করলো। সুখিয়া উপরে উঠে যেয়ে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে এসে বাঘের গায়ে ছুঁড়ে মারতেই প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছেড়ে বাঘটা একলাফে পাঁচিল ডিঙিয়ে জঙ্গলে পালালো। এরমধ্যে আর সবাই ছুটে এলো। মেয়েদের হাত ধরে নীচে নামিয়ে নিয়ে আসা হলো। ভয়ে নামতে পারছিলো না হাসিনা, ওকে কোলে করে নামিয়ে আনলো কাশেম। ভীষণভাবে আহত হয়েছে, কুকুরটা থর থর করে কাঁপছে, রক্ত ঝরছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। বাঘের থাবার আঘাতে বুক আর পিঠে মারাত্মক ক্ষতর সৃষ্টি হয়েছে। ওকে কোলে তুলে নিলো সুখিয়া, কুকুরটা একবার চোখ খুলে ওর প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলো আর খুললো না চোখ। কিছুক্ষন পরে সুখিয়ার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সে। দুর্গের সিঁড়ির উপরে শুইয়ে দিয়ে ওর গায়ে মাথা ঠেকিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলো সুখিয়া। চোখের জল মুছছে সবাই। দুর্গের সিঁড়ির পাশে গর্ত খুঁড়ে ওরা কবর দিলো ওকে। কবরের

উপর একটা বড় পাথর চাপা দিয়ে তার উপর সবাই একমুঠো করে নানারঙের ফুল ছড়িয়ে দিলো। তারপর কিছুক্ষন কুকুরটার জন্য প্রার্থনা করে গভীর বেদনার্ত হৃদয়ে সবাই আপনজন হারানোর ব্যাথা নিয়ে ঘরে ফিরে এলো।

সেদিন রাতে কেউ কিছু খেতে পারলো না। চুপচাপ বসে রইলো সবাই, সবার মন গভীর ব্যথায় আচ্ছন্ন, মেয়েরা কেউ কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রেডিও বন্ধ। কেউ কারো সাথে কথাও বলছে না। আজ একেবারে কাছ থেকে মৃত্যুকে দেখতে পেয়েছে ওরা। একটা কুকুর তার জীবন দিয়ে চারটে মেয়ের প্রাণরক্ষা করেছে। প্রভুভক্তি, কৃতজ্ঞতা এবং গভীর ভালবাসার পরিচয় দিয়ে নিজের জীবন দান করে তাদের রক্ষা করেছে সে। একদিনেই যেন ওদের বয়স একবৎসর বেড়ে গেলো।

একদিন বসন্ত, রোমু আর ঘনশ্যাম দুর্গের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। হঠাৎ ঘনশ্যামের চোখ পড়লো গাছের ডালে একটা পাখীর বাসার



দিকে। ঘনশ্যাম গাছে উঠে পাখীর বাসাটা পাড়তে গেলো। কদিন আগে এই বাসাটায় চমৎকার দুটো পাখীর বাচ্চা দেখেছিলো সে। গাছের ডাল বেয়ে সামনে এগিয়ে যেতেই মড় মড় শব্দে ডালটি ভেঙে পড়লো। ঘনশ্যাম ও সাথে সাথে পড়ে গেলো নীচে। কিন্তু ঠিক সময়ে লাফ দেওয়ার জন্য বেশী ব্যথা না লাগলেও ঘনশ্যামের হাঁটু ছড়ে রক্ত বেরোতে লাগলো। ঘাস চিবিয়ে ক্ষতস্থানে লাগাবে মনে করে ঘাস টেনে তুলতে যেতেই সে মাটি থেকে একটা গোল টাকার মতো জিনিস্ কুড়িয়ে পেলো। হাঁটুর ব্যথা ভুলে অবাক হয়ে সে ঐ বস্তুটার প্রতি চেয়ে রইলো। প্যাণ্টের সাথে ঘষে দেখে সেটা একটা সোনার টাকা। রোমু আর বসন্তও ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বসন্ত আর রোমু টাকাটা দেখে আনন্দে চীৎকার করে বললো, আরে এটাতো স্বর্ণমুদ্রা।

কোথায় পেলি? জিজ্ঞাসা করলো বসন্ত।

এইতো, ঠিক আমার পায়ের তলায়। ঘনশ্যাম জানালো।

তাহলে, এইখানে খোঁজা যাক যদি আরও পাওয়া যায়। মহাউৎসাহে রোমু বললো।

ওরা কাঠ—কুঠো দিয়ে জায়গাটার মাটি সরিয়ে দেখতে লাগলো। হটাৎ ঠক করে আওয়াজ হতেই, সেখানকার মাটি সরিয়ে একটা পাথর দেখতে পাওয়া গেল। চারপাশের মাটি সরিয়ে অনেক কষ্টে ওরা পুরো পাথরটাকে বের করলো। তিনজনে মিলে কাঠ দিয়ে চাপ দিতেই নড়ে উঠলো পাথরটা। পাথরটাকে তুলে ফেলতেই দেখা গেলো একটু গর্ত্ত মতো, চারপাশে ইঁটের গাঁথনি, নীচে একপাশে একটা কাঠের

দরজা দেখা যাচ্ছে। সুরঙ্গর অর্ধেকটা মাটি আর ভাঙ্গা রাবিশে ভর্তি। ওদের তিনজনের শক্তিতে কাঠের পাল্লাটা ফাঁক হতেই দেখা গেলো ছোট্ট একটা সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। ধাক্কা দিয়ে অতিকষ্টে ওরা দরজাটা খুলে ফেলতেই দেখে সামনে অন্ধকার পাথরের সিঁড়ি। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আগে নীচে নামতে অনুরোধ করতে, থাকে কিন্তু কেউই ঐ অন্ধকারে প্রথমে নামতে চায় না। তখন অনেক পরিশ্রম করে পুরো দরজাটা খুলে ফেললো ওরা। এবার কিছুটা আলোকিত হলো সিঁড়িটা। হাতে একটা লাঠি নিয়ে এবার ঘনশ্যাম নীচে নামতে শুরু করলো, কিছুটা নেমে সে বসন্ত আর রোমুকে ডাকলো। সিঁড়ির শেষে একটা চাতাল। সামনে আবার একটা কাঠের দরজা। দরজায় ধাক্কা দিতে যাবে হটাৎ পায়ে কি যেন ঠেকতেই আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো রোমু। লক্ষ্য করে দেখে দরজার সামনে নরকঙ্কাল ছড়িয়ে রয়েছে। মাথা দেখে মনে হয় দুটো মানুষের কঙ্কাল। পাশে দেওয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া অবস্থায় দু তিনখানা তলোয়ার, পিস্তল ও বন্দুক মেঝেতে মরচে ধরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিরাট একটা কুড়োল আর দুটো শাবলও দেখতে পাওয়া গেলো। মনে হয়, এখানে একসময় জোর লড়াই হয়েছিলো। ওরা কুড়োল আর শাবলটা দিয়ে দরজাটার উপর আঘাত করতে লাগলো। দরজাটা খুলে গেলো দড়াম করে। ভিতরে গভীর অন্ধকার। দম আটকানো ভ্যাপসা গন্ধ।

আমি আর এখানে থাকবো না। রোমু বললো। ভীষণ ভয় করছে আমার।

না, এতদূর এসেছি যখন, একবার ভেতরে যাবই। বসন্ত বললো।

ভিতরে যাওয়া যাবে না, ঘন অন্ধকার। আলো নিয়ে আসতে হবে। ঘনশ্যাম বললো।

তোরা একটু চুপ কর। আমার পকেটে চকমকি পাথর ছিলো, দেখি খুঁজে, আগুন জ্বালাতে পারি কিনা। বসন্ত বললো।

চকমকি ঘসতে ঘসতে বসন্ত একসময় শুকনো ঘাস পাতায় আগুন

জ্বালিয়ে ফেললো। তারপর কাঠকুটো এনে ঐ আগুনে ফেলে আগুনটাকে বেশ জোরদার করা হলো। ঘরের ভেতরটা এখন বেশ আলোকিত হয়েছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব। ওরা সাবধানে ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকলো। ঘরের ছাদ থেকে শিকলে একটা প্রদীপ ঝোলানো রয়েছে। স্যাঁতসেতে ঘরের মেঝেটা, কেমন যেন চট চট করছে। পায়ে কিসের গুঁতো খেতেই বসন্ত নীচু হয়ে দেখে আবার মানুষের কঙ্কাল।

বসন্ত চীৎকার করে উঠলো রোমু ঘনশ্যাম—দেখ আবার কঙ্কাল।

একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে এলো ঘনশ্যাম। সবার চোখেই পড়ে, একটা নয় অনেকগুলো কঙ্কাল বিভিন্ন ভঙ্গীমায় পড়ে রয়েছে মাটিতে। এদের পাশেও জং ধরা ছোরা, তরোয়াল ও বন্দুক রয়েছে। ভেতরের হাওয়ায় দমবন্ধ হয়ে আসছে। এতগুলো লোকের শেষনিশ্বাস ঘরের মধ্যে যেন আটকেছিলো এতকাল—আজ মুক্ত হলো। সেই সময়ে যে ভীষণ লড়াই হয়েছিলো এখানে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই লোকগুলোকে হয়ত আচমকা আহত করে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ওহ কি ভয়ঙ্কর ঘটনা। বসন্ত বললো।

না, আমি আর কিছুতেই এখানে থাকবো না। আমি বাইরে যাব। আমার ভীষণ ভয় করছে। রোমু আতঙ্কে ঘামতে ঘামতে বললো।

—হ্যাঁ চল, আমারও শরীর খুব খারাপ লাগছে। ভয় করছে। যদি এখান থেকে বেরোতে না পারি আমাদেরও এই দশা হবে। চল ঘনশ্যাম—বসন্ত দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলে।

জ্বলন্ত কাঠটা হাতে নিয়ে ঘনশ্যাম তখনও সন্ধানী চোখে চারদিকে দেখছে। হটাৎ আলো পড়ে দেওয়ালের গায়ে কুলঙ্গীতে কি একটা যেন ঝিকমিক করে উঠলো। ঘনশ্যাম বলে ওঠে, এই রোমু, বসন্ত, একটু দাঁড়া। আমি এক্ষুনি আসছি। রোমু আর বসন্ত আবার ফিরে আসে ঘরে। কঙ্কালগুলোকে ডিঙ্গিয়ে ঘনশ্যাম কুলঙ্গীর সামনে যেয়ে উপস্থিত হয়। পথরের খুব সুন্দর একটা গণেশমূর্ত্তি। মুর্ত্তিটার চোখদুটো আলো পড়ে জ্বলজ্বল করছে। মুর্ত্তিটার গলায় একটা ঝকমকে পাথরের মালা,

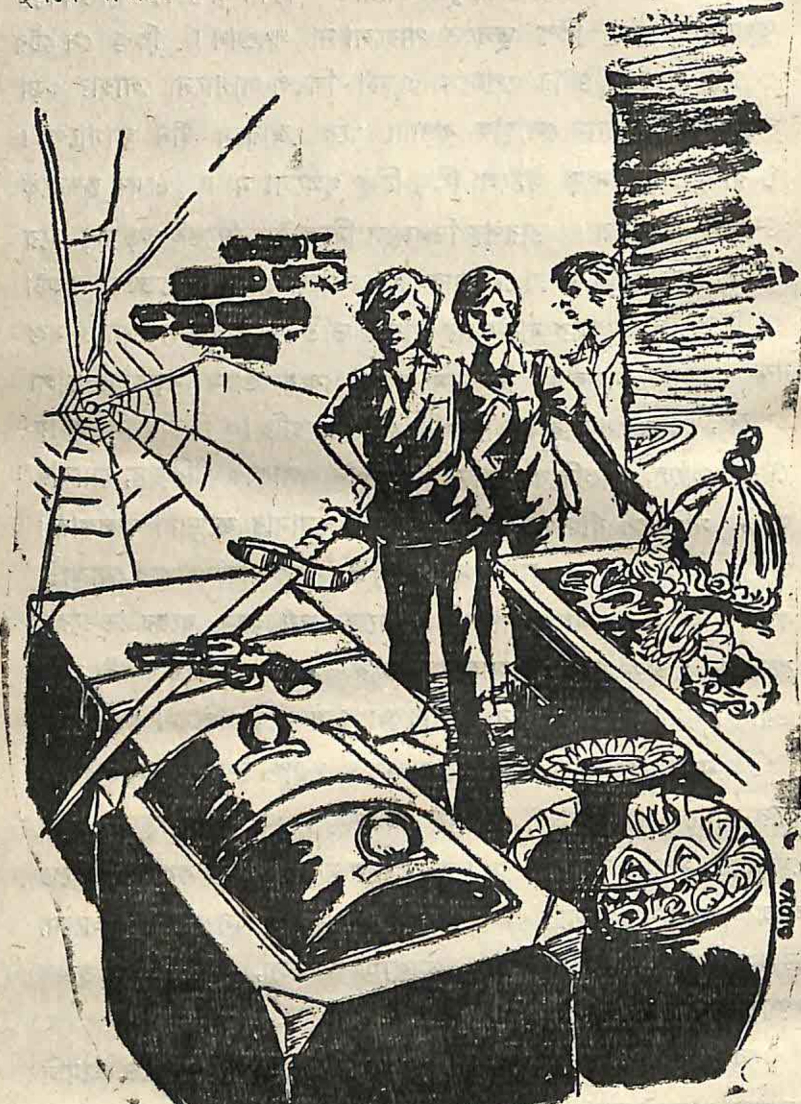
লাল নীল সাদা পাথরগুলো আলো পড়ে ঝকমক করছে। ঘনশ্যাম বুঝতে পারে ওগুলো হীরে চুনী পান্না। গণেশ মূর্ত্তিটাকে হাত দিয়ে তুলতে গেলো, কিন্তু তুলতে পারলো না ঘনশ্যাম। কিন্তু সে টের পেলো গণেশমুর্ত্তিটার পেছনে একটা শিকল লাগানো লোহার কড়া রয়েছে। ঘনশ্যাম লোহার কড়াটা ধরে জোরসে টান লাগালো। পুরো কুলঙ্গীটা নড়ে উঠলো কিন্তু কিছু খুললো না। ওদের দুজনকে ডাকলো ঘনশ্যাম। তারপর তিনজনে মিলে টান দিতেই কড় কড় করে কুলঙ্গীসুদ্ধ একটা দরজা দেওয়াল থেকে খুলে এলো। ভেতরে একটা ছোট্ট ঘর, ধুলো আর মাকড়সার জালে ভর্তি। তারমধ্যে তিনটে মস্ত মস্ত লোহার সিন্ধুক। ঘনশ্যাম দৌড়ে যেয়ে প্রথম সিন্ধুকটার ডালা খোলে, দেখে সোনার টাকা অর্থাৎ মোহরে ভর্তি। দ্বিতীয় সিন্ধুকটায় দেখা গেলো একদিকে রয়েছে মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ, সোনার মুকুট, মণিমুক্তা বাঁধানো ছড়ি, অন্যদিকে সোনার জড়োয়া অলঙ্কার। তৃতীয় সিন্ধুকটা শুধু লাল নীল সবুজ হলুদ সাদা পাথরে বোঝাই, ঝকঝক করছে। আলো পড়ে মনে হচ্ছে সূর্য যেন ঘরের ভেতরেই রয়েছে। ডালা খুলতেই আলোয় ভরে উঠলো চারদিক। হাঁ করে ওরা নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলো বিপুল ধনসম্পদের দিকে।

আনন্দে লাফাতে লাগলো ঘনশ্যাম, দুহাত উপরে তুলে হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো। সোনার মোহরগুলোকে হাতে তুলে তুলে মেঝেতে ফেলতে লাগলো সে। বন্ধ ঘরের মধ্যে টুং টাং করে শব্দ হতে লাগলো। মোহরগুলোর উপর কি যেন লেখা। বসন্ত দেখে বললো, রোমান হরফে লেখা রয়েছে। ঘনশ্যাম বললো, এগুলো মনে হচ্ছে পর্তুগীজদের লুটের মাল।

রোমু যেই হীরে জহরতের সিন্ধুকের দিকে এগোতে গেছে, অমনি ঘনশ্যাম বলে উঠলো, রোমু—কোনকিছুতে হাত দিবি না। এই গুপ্তধন আমি আবিষ্কার করেছি, এর সব সম্পদ আমার। আমিই এর মালিক।

রোমু অবাক চোখে ঘনশ্যামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

হ্যাঁ, তবে তোদের আমি কিছু সম্পদ দেবো, কেননা তোরা দুজনে আমাকে গুপ্তধন উদ্ধারে সাহায্য করেছিস। কিন্তু আর কাউকে



এই গুপ্তধনের একটা পাইপয়সাও দেব না আমি। খোলা সিন্ধুকগুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে বসন্ত, লোভে চকচক করছে ওর চোখ।

ঠিক আছে। তুই যা বলবি তাই হবে। বসন্ত বললো।

এই গুপ্তধনের কথা কাউকে না বলার শপথ নিতে হবে তোদের। তাছাড়া তোরা ভবিষ্যতে এই গুপ্তধন উদ্ধার করতে আমাকে সাহায্য করবি এবং সবসময় এখানে পাহারা দিবি যাতে আর কেউ এর খোঁজ না পায়।

বসন্ত ও রোমু হাঁ করে ঘনশ্যামের কথা শুনছিলো। কিছুক্ষণ পরে ঘোর ভেঙ্গে বসন্ত বলে উঠল, হ্যাঁ প্রতিজ্ঞা করছি। বসন্তর কথা শুনে রোমুও ঐ একই কথা বললো।

ঘনশ্যাম বললো, আজ থেকে আমরা সবকাজ একসঙ্গে করবো। এই দ্বীপ আমাদের, আমরা এই দ্বীপ শাসন করবো। আমি হলাম এই দ্বীপের রাজা। বসন্ত, তুই হবি আমার মন্ত্রী আর রোমু হবে সেনাপতি। আর বাকি সবাই আমাদের প্রজা। ওরা আমাদের আদেশমতো কাজ করবে, আমাদের সেবা করবে।

বসন্ত ও রোমু নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঠিক করলো, ঘনশ্যামকে রাজাসাহেব ঘনশ্যামজী মহারাজ বলে ডাকবে।

ঘনশ্যাম এবার সিন্দুক থেকে সাজ পোশাক পরতে শুরু করলো। মস্ত বড়ো সোনার সুতোয় কাজকরা একটা লাল সিল্কের জোব্বা আর পাজামা, মাথায় একটা মুকুট, তার উপর আবার মুক্তোর মালা জড়ানো। গলায় দু তিনটে মণিমুক্তোর হার, হাতের আঙুলে বিরাট একটা হীরে বসানো আংটি। সত্যিই ঘনশ্যামের চেহারা পালটে যেন রাজা মহারাজের মতো লাগছিলো। অবশ্য পোশাক পরিচ্ছদগুলো ওর গায়ে ঢলঢল করছিলো। বসন্ত বলে উঠলো,—জয়, রাজাসাহেব ঘনশ্যামজী মহারাজ কি জয়।

এবার বসন্ত আর রোমুও ঐ রকম ঢলঢলে জবরজং পোষাক পরে মাথায় মুক্তোর মালা, গলায় হার জড়িয়ে ঘর থেকে বেরোল। রাজা সাহেব আর মন্ত্রীর হাতে দুটো মণিমুক্তা বসানো দণ্ড ও কোমরে ছোরা আর পিস্তল গোঁজা। সেনাপতি রোমুর কোমরে তরোয়াল, কাঁধে

ঝোলানো বন্দুক আর হাতে সেই বিরাট কুড়োলটা। সে কুড়োলটা কাঁধে ফেলে বাঁ পা ডান পা ধপ ধপ করে ফেলতে ফেলতে সামনে এগিয়ে চলেছে আর মুখে বলছে,—হাটো হাটো, সামনেওয়ালা ভাগো, মহারাজজী আসছেন।

কিছুক্ষন পরে ঐ রকম অদ্ভুত সাজে তিনজনে ওদের বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলো। রোমু তখনও বলে চলেছে, হাট যাও, সাবধান ! শ্রীল্ শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব ঘনশ্যামজী মহারাজ আ রাহা হ্যায়।

ঘনশ্যাম আর বসন্তর মুখ গম্ভীর, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। অবাক চোখে সবাই ওদের দিকে চেয়ে রইল। কি ব্যাপার বুঝতে পারছে না কেউ। ওদের গুপ্তধন পাওয়ার খবর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো। যে যেখানে ছিলো, জড়ো হলো ওদের দেখার জন্য। ঘনশ্যাম তার মন্ত্রী বসন্ত এবং সেনাপতি রোমুকে নিয়ে একটা উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে কৃত্তিম স্বরে বলতে শুরু করলো, সবাই শোন, আজ থেকে আমি এই দ্বীপের রাজা বলে নিজেকে ঘোষনা করছি,—শ্রীযুক্ত রাজা সাহেব ঘনশ্যামজী মহারাজ।

বসন্ত এবং রোমু চীৎকার করে বললো, রাজাসাহেব ঘনশ্যামজী মহারাজ কী জয়। ছেলেমেয়েরাও মজা পেয়ে সমস্বরে বলে উঠলো, জয়-জয়, মহারাজ কী জয়।

ঘনশ্যাম আবার বলতে শুরু করলো, আজ থেকে এই দ্বীপটা আমার রাজ্য। এই দ্বীপের সব কিছু আমার অধিকারে, তোমরা আমার প্রজা। আজ থেকে আমার আদেশ অনুযায়ী কাজ করবে তোমরা। বসন্তকে দেখিয়ে বললো, এ হলো আমার মহামন্ত্রী। আমার আদেশ এর মুখ থেকে তোমরা শুনতে পাবে। রোমুকে দেখিয়ে বললো, এ হলো আমার সেনাপতি। শত্রুর সাথে যুদ্ধ এবং রাজ্য মধ্যে যারা রাজাদেশ মানবে না, বেয়াদপি করবে, তাদের শায়েস্তা করবে সেনাপতি। তোমরা আমাকে মহারাজ, বসন্তকে মন্ত্রীসাহেব এবং রোমুকে সেনাপতি সাহেব বলে ডাকবে।

তারপর বসন্তর দিকে তাকিয়ে বললো, কি মন্ত্রী সব ঠিক আছে তো।

হ্যাঁ, সাহেব। বসন্ত উত্তর দিলো।

ঘনশ্যাম গম্ভীর স্বরে বসন্তকে এক ধমক দিয়ে বললো, ঠিকসে বাত বোল, বলবি হাঁ মহারাজজী, বুঝেছিস্।

হাঁ মহারাজজী, বসন্ত বললো।

কয়েকদিন ধরে খুব মজা হলো! সবাই মিলে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি খেলা খেললো। রাজা মন্ত্রী ও সেনাপতিকে আসনে বসিয়ে, দরবার সাজিয়ে হৈ হুল্লোড় করে মজা করা হতো। ছেলেমেয়েরা সবাই ওদের মহারাজজী, মন্ত্রীজী এবং সেনাপতিজী বলে সম্বোধন করতো। কিন্তু দুচারদিন পরে সবাই বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো যে ওরা সত্যি সত্যিই নিজেদের রাজা, মন্ত্রী ও সেনাপতি বলে মনে করছে। সবাই যেটাকে একটা নতুন খেলা হিসাবে ধরে নিয়ে মজা করছিলো, ওরা সেটাকে সত্যি বলে গ্রহণ করেছে। নিজেদের সত্যি সত্যিই রাজা মন্ত্রী সেনাপতি বলে মনে করে ওদের উপর কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে এবং সত্যিই সত্যিই নির্দেশ দিতে শুরু করেছে। অদ্ভুতভাবে সবসময় ঐ জবরজং পোষাক পরে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা।

একদিন রোমু হাসিনাকে ডেকে বললো, আমার তেষ্টা পেয়েছে, ডাব কেটে জল দেতো।

আমি তোমার ঝি নই, নিজে ডাব কেটে জল খাও। হাসিনা উত্তর দিলো।

রোমু হাসিনাকে ধমক লাগাতে কেঁদে ফেললো হাসিনা।

ঘনশ্যামের কাপড়-চোপড় কাচতে অস্বীকার করে গুরমুখ বললো, এতকাল তুমি নিজের কাপড়-চোপড় নিজেই ধুয়েছ, এখন আমি তোমারটা ধোব কেন?

দেখিছিস্ না আমি রাজা, আমি নিজে হাতে কাজ করতে পারি না, তোরা আমার প্রজা, আমার সব কাজ তোরা করে দিবি, বুঝলি।

ওরে আমার রাজারে। নিজে কাপড় কাচতে পারবে না, খাবার খেতে পারবে না। অন্যলোক তোমাকে হাতে করে জল এনে

দেবে। তুমি রাজা না গজা? সুখিয়া রেগে বললো।

ঘনশ্যাম একথায় প্রচণ্ড রেগে রোমুর কাছ থেকে বন্দুকটা নিয়ে বললো,—বেয়াদব, বেতমিজ। আমার আদেশ মানতে চাস না। তোকে এক্ষুণি গুলি করবো আমি।

যমুনা, সুধা ছুটে এলো। ঘনশ্যামকে বললো, কি ব্যাপার, তুমি এরকম করছো কেন?

বসন্ত এগিয়ে এসে বললো, মহারাজের আদেশ যে না মানবে তাকে শাস্তি পেতে হবে, বেয়াদবি করলে গুলি করা হবে।

রোমু তার বিরাট মোটা চেহারায় অদ্ভুত পোষাকের কোমর বন্ধ থেকে তরোয়ালটা খুলে সবাইকে শাসাতে লাগলো,। সুখিয়া কে বললো, মহারাজের কাছে এক্ষুনি ক্ষমা চা, নাহলে তোকে শাস্তি পেতে হবে।

এই কাণ্ড দেখে সবাই বিমূঢ়। মেয়েরা আতঙ্কিত হয়ে সুখিয়াকে ভুল স্বীকার করতে অনুরোধ করলো।

সুখিয়া ভুল স্বীকার করাতে ব্যাপারটা আপাতত মিটে গেল।

এরপর থেকে ওরা দুদলে ভাগ হয়ে গেলো। একদলে ঘনশ্যাম, বসন্ত আর রোমু অন্যদলে বাকি সবাই। ঘনশ্যাম মেয়েদের মণিমুক্তো গয়নার লোভ দেখিয়ে দলে টানতে চাইলো, কিন্তু কেউ ওদের দলে গেলো না। সুধাকে সে রাজকন্যার পদ দিতে চাইলো। সুধা বললো, তুমি পাগল হয়ে গেছ, তোমার চিকিৎসার দরকার। ঘনশ্যাম সুধার দিকে কটমট করে চাইলো। রোমু কয়েকজনকে ওর সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিতে বললো, কিন্তু কেউই গেলো না। কিন্তু ওদের পাগলামি ঘুচলো না। বাকি সবায়ের সাথে ওরা চাকরের মতো ব্যবহার করতে লাগলো। কিন্তু এর প্রতিবাদও করা যাচ্ছে না, ওদের কাছে বন্দুক, পিস্তল, তরোয়াল, ছোরা ও কুড়োল রয়েছে।

ভয়ে সবাই ওদের কাজ করে দেয়। ওরা তিনজন বসে বসে আদেশ করে, সবচেয়ে ভাল খাবার খায়, সবচেয়ে ভাল জায়গায় শোয়। কেউ আদেশ পালন না করলেই তাকে শাস্তি দেয়, গুলি করার ভয় দেখায়।

একদিন সন্দীপ রেগে বললো, আমার পক্ষে ঐ উজবুগ ঘনশ্যামের আদেশ মতো চলা আর সম্ভব নয়। আমাকে ফের কিছু করতে বললেই আমি ওকে পেটাবো।

আমি তোর দলে, কাল রাত্রে আমাকে দিয়ে পা টিপিয়েছে। এ আর সহ্য হয় না। কাশেম বললো।

পেটাতে তো পারি, কিন্তু ভয় করে যদি সত্যিই ও কাউকে গুলি করে দেয়। সুখিয়া বললো।

আরে গুলি করলে করবে। কি করবো, আমাকে কাল ওদের তিনজনকে চান করাতে হয়েছে। অন্য দুটো তবুও যা, কিন্তু ঐ রোমুটাকে চান করানো আর একটা হাতিকে চান করানো একই ব্যাপার। ধামুয়া বললো।

কাজলা আর যমুনা দুজনেই প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, আমরা আর ওদের মাথা থেকে উকুন বাছতে পারবো না। কতকালের পুরোনো নোংরা পোশাক পরিচ্ছদ পরে থাকে ওরা। কি জঘন্য ব্যাপার, আমরা আর এসব সহ্য করতে পারছি না।

মেরী আর হাসিনা বললো, খাবার দিতে একটু দেরী হলেই কি চোটপাট, কাল আমাদের মুখে কলার খোসা ছুড়ে মেরেছে। এত কষ্ট করে সবাই খাবার জোগাড় করে, রান্না করে, কিন্তু ওদের মুখে কিছু রোচে না। এটা খাবো না, ভাল খাবারটা নিয়ে আয়—সব সময় এরকম হুকুম চালায়। আমরা আর ওদের খাওয়াতে পারবো না।

ধামুয়া বললো, দাঁড়া আজ ঐ রাজা বাদশাদের মজা দেখাচ্ছি।

কিন্তু কিভাবে? কাশেম জিজ্ঞাসা করলো?

আমি একটা মৎলব বের করেছি। সুখিয়া বললো।

কি, কি বল? কাশেম বললো।

সুখিয়া কাশেমের কানে কানে কিছু বললো। কাশেম হেসে বললো, ঠিক আছে।

এরপর থেকে সবাই রাজা মন্ত্রী সেনাপতির কাজকর্ম বেশী মনো-

যোগ দিয়ে করতে লাগলো। যে যখন যা আদেশ করছে৺ ছুটে যেয়ে সবাই তামিল করছে। সবাই যেন ওদের ভয়ে ভয়ে আছে এমন ভাব দেখাতে লাগলো। সবচেয়ে ভাল খাবার কলার পাতায় ভাল করে গুছিয়ে ওদের পরিবেশন করলো সুধা।

মেরী একটা তালপাতা নিয়ে খাওয়ার সময় ওদের হাওয়া করতে লাগলো।

সমস্ত দিন শান্তিতে নিরুপদ্রবে কেটে গেলো। রাতে ওদের জন্য ভাল করে পাতা বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লো ওরা।

গভীর রাতে সুখিয়া, গুরমুখ আর কাশেম বিছানা থেকে চুপি চুপি উঠে পড়ে ধীরে ধীরে মহারাজা মন্ত্রী এবং সেনাপতির বিছানার দিকে এগোল। তারপর বন্দুক, পিস্তল, তরোয়াল, ছোরা আর কুড়োল একে একে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলো সমুদ্রের গভীরে। তারপর গুপ্তধনের ঘরে যত অস্ত্র শস্ত্র জমা ছিলো, সব নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি তাদের অস্ত্র শস্ত্র খুঁজে না পেয়ে বেজায় বিপদে পড়লো। ভয় পেয়ে ভাবলো, এবার বোধ হয় ওদের আর কেউ মানবে না। কিন্তু দেখা গেলো, সবাই পূর্বের মতই ওদের আদর যত্ন করছে। বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলো তারা। দুপুরে সবাই একসঙ্গে খেতে বসলো, সবার সামনে কলাপাতা বিছানো হলো। যথারীতি রাজা, মন্ত্রী এবং সেনাপতি মশাইয়ের জন্য আলাদা খাবার জায়গা হয়েছে। কিন্তু খাওয়ার সময় দেখা গেলো, সবার সামনে খাবার দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ওদের পাতায় খাবারের বদলে শুধু সোনার মোহর, মণিমুক্তো দেওয়া হচ্ছে। মুখ টিপে টিপে হাসছে সবাই। বেজায় রেগে ঘনশ্যাম চীৎকার করে উঠলো, এসব কি! রাজামশাই এর সাথে ইয়ার্কি হচ্ছে?

পরিবেশন করতে করতে মেরী উত্তর দিলো, কোনো ইয়ার্কি নয়, এই হলো তোমাদের খাবার।

আমরা এই সোনা আর পাথর খাবো? রোমু করুন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা

করলো।

তোমরা যখন আমাদের থেকে এই সোনা আর পাথরকেই বেশী ভালবাস, এই গুলো পেয়ে আমাদের উপর হুকুমজারী করছো, তাহলে সেই পাথরই তোমরা খাও। সুধা হাসতে হাসতে উত্তর দিলো।

কি হচ্ছে, খেতে দাও বলছি। খাবার সময় রসিকতা ভাল লাগছে না। ঘনশ্যাম বললো।

কেন রাজা সাহেব বাহাদুর, আমরা অন্যায় কথা একটুও বলছি না। এই ধনরত্ন আপনাদের—আপনারাই এর সদ্‌ব্যবহার করুন। খাবার গুলো কি খারাপ—মোহরের সোনালী পোলাও, মণিমুক্তোর কোর্মা, সোনার লাড্ডু।

এসব কি খাওয়া যায়। ঘনশ্যাম রেগে বললো।

কেন মহারাজ, একবার মুখে দিয়ে দেখুন, ভালই লাগবে খেতে। গুরমুখ বললো।

ঘনশ্যাম বেজায় রেগে গুরমুখকে ঘুষি মারতে গেলো। সুখিয়া গুরমুখ, কাশেম, ধামুয়া সবাই উঠে ঘনশ্যামকে ঘুসি দেখিয়ে বললো, খবরদার, তোর জুলুম অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। এই বলে ঘনশ্যাম বসন্ত আর রোমুকে টানতে টানতে নিয়ে চললো ওদের বাড়ির ভেতরে। লাইব্রেরী ঘরে ওদের বন্দী করে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর সবাই আবার মিলে মজা করে খাওয়া দাওয়া করতে লাগলো।

ওরা তিনজন জবংজং পোষাক আর গয়না পরে ঘরের জানালা দিয়ে ওদের পানে চেয়ে রইলো।

রোমু খিদের চোটে অস্থির হয়ে চীৎকার শুরু করে দিলো। কাশেমকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, আমরা কি সত্যি সত্যিই খেতে পাবো না।

না তোমরা তো বন্দী। খাওয়া দাওয়া একদম বন্ধ। কাশেম ঘোষনা করলো।

কি করলে খেতে পাবো ? বসন্ত করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো।

আগের মতো নিজের কাজ নিজেকে করতে হবে এবং সবার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। সুখিয়া উত্তর দিলো।

আমি কাজ করতে রাজী আছি, বসন্ত বললো।

মন্ত্রী খুব সাবধান, আবার এরকম কথা বললে তোমাকে মন্ত্রীত্ব থেকে বরখাস্ত করবো। ঘনশ্যাম চটে বললো।

মহারাজ, কথাটা মেনে নিন্। কাজ না করলে আমরা খেতে পাবো না। রোমু বললো।

ঘনশ্যাম কিছু উত্তর দিলো না।



ছেলেমেয়েরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে মুক্তির আনন্দে সবাই গান গাইতে শুরু করলো। মেয়েরা তালে তালে নাচতে শুরু করলো।

ঘনশ্যামজী মহারাজ

খাবেন আজ, মোতির সাজ।

মন্ত্রী তার বসন্তবাবু

আজ চাখবেন হীরের নাড়ু।
সেনাপতি রোমু সিং
সোনার পোলাও মুখে দিয়ে
নাচবেন ধিন্‌তা ধিন্‌।

ছোট ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে ওদের দিকে চেয়ে নাচতে গাইতে লাগলো,

তা-তা-তা—ধিন-তা-ধিনা
তা-তা-তা—ধিন-তা-ধিনা
আমাদের মহারাজ
করেন না কোন কাজ,
আমাদের মন্ত্রী মশাই
অকাজের বড় গোঁসাই,
আমাদের সেনাপতি
মোটা যেন গোদা হাতি।
তা-তা-তা—ধিন-তা-ধিনা
তা-তা-তা—ধিন-তা-ধিনা

এবার রঞ্জন, সন্দীপ, সুখিয়া, ধামুয়া ও কাশেম সবাই গাইতে শুরু করলো আর একটা নতুন গান,

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি
মাথায় হীরের তাজ,
ঘরে বসে খায় যে ওরা
করে না কোন কাজ
যত কিছুই বল না কেন
ওদের নাইকো মোটে লাজ।

মেয়েরা এসে ধুয়ো ধরলো,

ছি—ছি—ছি—ছিঃ
করে না কোন কাজ

ছি—ছি—ছি—ছিঃ

নাইকো মোটে লাজ।

ছেলেরা আবার গাইতে শুরু করলো,

এবার মহা-রাজাধি-রাজ

খুলে ফেলো মাথার তাজ

তোমার রাজত্ব খতম আজ।

মেয়েরা গলা মেলালো,

আহা আজ গুলি

বন্দুকের নাইকো ভয়

হয়েছে আমাদের

সবার জয়।

তা-তা-তা—ধিন-তা-ধিনা

আবার ছেলেরা ধরলো,

নেমে এসো মোদের সাথে

হাতে হাত মিলাও হাতে

সবার সাথে হাত মিলিয়ে

করো যদি কাজ

তবেই শুধু খেতে পাবে,

খেতে পাবে আজ।

গান শুনে লজ্জিত হয়ে বসন্ত তার গলার হার, হীরের বাজুবন্দ জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেললো। রোমু গলাথেকে মুক্তোর মালা, সোনার মুকুট ছেলেদের দিকে ছুঁড়ে দিলো। অবশেষে ঘনশ্যাম তার স্বঘোষিত খেতাব ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করে মাথায় হীরের মুকুটটা খুলে ফেললো। তারপর যখন সব গয়না আর সেই লাল রঙের জোব্বাটা খুলে ফেললো সে, তখন ঘরের দরজা খুলে দেওয়া হলো। ওরা আবার আগের মতো সবার সাথে মিলে নাচ গান, হৈ হুল্লোড় শুরু করে দিলো। আবার পুরোনা দিনের মতো চলতে লাগলো ওদের জীবন।

একদিন ওরা ঘরের সামনে বসে আছে, হঠাৎ ভোঁ ভোঁ করে আওয়াজ কানে যেতেই উৎকণ্ঠিত হয়ে সবাই আকাশের দিকে তাকালো।



চিৎকার করে উঠলো সুখিয়া, উড়োজাহাজ, উড়োজাহাজ। সুখিয়ার চীৎকার শুনে হৈ হৈ করে সবাই সমুদ্রের তীরে ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হলো। সবাই হাত নেড়ে চীৎকার করতে লাগলো,—থামাও, থামাও।

কিন্তু প্লেনটা না থেমে সোজা সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে গেলো।

এতগুলো প্লেন আমাদের দ্বীপের উপর দিয়ে চলে যায়, কিন্তু একটাও থামে না। বসন্ত দুঃখ করে বললো।

আচ্ছা, আমরা প্লেনকে যেমন দেখতে পাই, প্লেনের পাইলটরা কি আমাদের তেমনি দেখতে পায় না? হাসিনা প্রশ্ন করলো।

মনে হয় দেখতে পায়, সুধা বললো।

তাহলে ওরা আমাদের উদ্ধার করে না!কেন? মেরী জিজ্ঞাসা করলো।

কি জানি কেন করে না, আমাদের কথা সবাই বোধহয় ভুলে গেছে। সুধা বললো।

হয়ত অত উঁচু থেকে প্লেনের পাইলটরা আমাদের গলারস্বর শুনতে পায় না অথবা গাছের আড়াল থেকে দেখতে পায় না আমাদের। কিন্তু পাহাড়ের উপরে আমাদের বাড়ি কিংবা রাতের বেলায় দুর্গের উপরে জ্বালানো আগুন নিশ্চয়ই ওরা দেখতে পায়। কাশেম বললো।

হ্যাঁ এটা ঠিক, ওরা আমাদের সুন্দর বাড়ি অথবা আগুন দেখে মনে করে, এই দ্বীপে হয়ত আরও অনেক লোকবসতি আছে।

কিন্তু ওরা কি আমাদের দেখেও টের পায় না, যে আমরা সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়ে, এইখানে আশ্রয় নিয়েছি।

হয়ত বুঝতে পারে না অথবা ওরা বোধহয় মনে করে এই দ্বীপের আদি বাসিন্দা ছেলেমেয়েরা হাত নেড়ে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। আর যাদের এতো সুন্দর ঘরবাড়ি তারা আবার অনাথ হবে কি করে। রোমু বললো।

তাহলে, আমাদের বাড়িটাই দেখা যাচ্ছে আমাদের বড় শত্রু। যদি এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পেতে হয় তাহলে ঐ বাড়িটাকে আগে ভেঙ্গে ফেলা দরকার। আমি আজই ঐ বাড়ি ভেঙ্গে ফেলতে চাই—বলো কে যাবে আমার সাথে? ঘনশ্যাম উত্তেজিত হয়ে বললো।

কি পাগলামি করছ ঘনশ্যাম? ঘর না থাকলে আমরা রোদ, বৃষ্টি, ঠাণ্ডায় থাকবো কোথায়? সুখিয়া বললো।

কিন্তু ঘনশ্যামের সাথে আরোহ্ চারজন জুটে গেলো। হতাশা থেকে ওরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সুখিয়াকে সরে যেতে বললো ওরা।

কিন্তু সুখিয়া, ধামুয়া, সন্দীপ ও মেয়েরা এগিয়ে গেলো। সুখিয়া বললো, এ ঘর আমরা ভাঙতে দিতে পারি না। আমরা সবাই মিলে কত কষ্টে এই বাড়ি তৈরী করেছি। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এ ঘর রক্ষা করা দরকার।

ঘনশ্যাম সুখিয়াকে ধাক্কা মেরে এগোতে যাবে এমন সময় আবার ভোঁ ভোঁ-ফট ফট শব্দ শোনা গেলো।

আবার সবাই দৌড়ে সমুদ্র তীরে গেলো। একটা হেলিকপ্টারকে বেশ নীচু দিয়ে উড়ে আসতে দেখা যাচ্ছে।

সবাই চীৎকার করে ওঠে, এরোপ্লেন, এরোপ্লেন।

প্লেন নয়, হেলিকপ্টার, ঘনশ্যাম বললো।

হেলিকপ্টারটা কিন্তু নারকেল গাছের উপর দিয়ে উড়ে চলে গেলো। হৈ হৈ করে উঠলো সবাই।

এটাও আমাদের উদ্ধার করলো না, হতাশ ভাবে ঘনশ্যাম বললো।

মনের দুঃখে, হতাশায় সবাই বালির উপরেই বসে পড়লো। সুধা, হাসিনা, ওমেরী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সবারই মনে

হতে লাগলো, ওদের কথা ভুলে গেছে সবাই। উদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনা নেই ওদের। হঠাৎ আবার শব্দ, ঐ হেলিকপ্টারটাই ফিরে আসছে আবার। একেবারে নীচু দিয়ে উড়ে এলো হেলিকপ্টারটা।

ছেলেমেয়েরা হেলিকপ্টারের মধ্যে তাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বসে থাকতে দেখলো। আনন্দে চীৎকার করে উঠলো সবাই, —স্যার, আমরা এখানে।

হেলিকপ্টারটা জঙ্গলের মধ্যে গেলো, কিছুক্ষনের মধ্যে আবার ঘুরে এসে বেলাভূমিতে নামলো। চালক এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয় নেমে এলেন। ছেলেরা ঘিরে ধরলো তাঁকে, মেয়েরা আনন্দে খুশীতে চোখের জল মুছতে লাগলো।

শিক্ষক মহাশয় সবার খোঁজ খবর করলেন। সবাই সুস্থ আছে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। সবার নাম লিখে নিয়ে উনি বললেন, একেবারে তো তোমরা সবাই যেতে পারবে না, কয়েকবার আসা যাওয়া করতে হবে। যাইহোক, প্রথমে মেয়েরা যাবে। মেয়েরা তোমরা প্রস্তুত হয়ে নেও।

স্যার আমার একটা কথা আছে, সুধা এগিয়ে এসে বললো। আমরা এখানে একটা বাড়ি তৈরী করেছি স্যার—এতকাল আমরা ঐ বাড়িতেই বাস করেছি। নাম দিয়েছি 'আমাদের বাড়ি'। সবাই মিলে চলুন স্যার, ঐখানে একবার যাই। শেষ বারের মতো আমাদের বাড়িকে দেখে আসি।

হেলিকপ্টটার চালকও সঙ্গে চললো। সমস্ত ছেলেমেয়েরা, স্যার এবং চালক বাড়ির সামনে যেয়ে উপস্থিত হলো।

প্রধান শিক্ষক, ওদের চমৎকার বাড়ি এবং লাইব্রেরী ও স্কুল দেখে পরম আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ছাত্রছাত্রীরা তাদের ধান গম চাষ, মটর শুটির ক্ষেত, ছাগলের খোয়াড় দেখিয়ে শিক্ষক মহাশয়কে অবাক করে দিলো। শিক্ষক মহাশয় তার ছাত্রছাত্রীদের সব কিছু দেখে খুশী হয়ে বলতে লাগলেন, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। ওরা এবার বাড়ির সামনে

দাঁড়িয়ে ওদের স্কুলের প্রার্থনা আবৃত্তি করলো, তারপর ঐ বাড়িকে প্রণাম জানিয়ে সবাই মিলে আনন্দ ধ্বনি দিলো—'আমাদের বাড়ি'।

বাড়ি ফেরার আনন্দে সবাই উল্লসিত হলেও এই মুহূর্তে ওদের এতোদিনের আশ্রয়দাতা দ্বীপ ও ওদের হাতে গড়া বাড়ি ছেড়ে যেতে সবার মন বেদনায় ভারি হয়ে উঠলো।

চলুন স্যার এবার এগোনো যাক, হেলিকপ্টার চালক তাগাদা দিলেন, না হলে ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

সবাই ধীর পদে ব্যথিত হৃদয়ে সমুদ্র তীরের দিকে এগিয়ে চললো।